করোনার কবলে বাংলার শারদবাণিজ্য

শিবানী চৌধুরী
এফ ই- ৪৭৫/৫

প্রকৃতির নিয়মেই নিবিড় ঘনঘোর বর্ষার পরই আগমন হয় শরৎঋতুর, নীল অকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে শরত যেন হেসে ওঠে অরুণ আলোর অঞ্জলি নিয়ে আর সেই সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে দুর্গোৎসবের আগমনী গেয়ে।

শারদোৎসব বা দুর্গাপূজা শুধু বাঙ্গালীর ধর্মীয় উৎসবই নয়, সামাজিক, এমনকি অর্থনৈতিক জগতেও বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকেই ভাবেন পুজো এলেই কাজ বন্ধ, অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ সব ছুটি। দোকান, বাজারও অনেক বন্ধ থাকে। অর্থনীতির চাকা অচল হয়ে পড়ে ফলে সমাজের ক্ষতি, কিন্তু পুজোর উৎসবে বরং অর্থনীতি নানা দিকে লাভবান হয়।

শুধু এখনকার কথা নয়, পুরনো হিন্দুশাস্ত্রেও পাওয়া যায়, পুজোর ঐতিহ্য ও পরম্পরার মধ্যে অর্থনীতির বিশেষ ভূমিকার কথা।

সুদীর্ঘকাল ধরেই পুজোকে কেন্দ্র করে সমাজে বিভিন্ন জাতি বর্ণভিত্তিক পেশাগত মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান প্রদান চলেছে। মৃৎশিল্পী, কুমোর, ঢাকি, নাপিত, মালাকার, পটুয়াশিল্পী, তাঁতি, গোয়ালা, ময়রা, পুরোহিত, ডেকরেটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন বর্গের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে পুজোতে যুক্ত থেকেছেন। সারা বছরই তাঁরা এই সময়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন।

বাংলার শারদোৎসব আড়ম্বরের নিরিখে ব্রাজিলের বিখ্যাত কার্নিভ্যাল 'রিও ডি জেনেইরোর' চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। কার্নিভ্যালকে ঘিরে যেমন অর্থনীতি শক্তি ও সচলতা পায়, আমাদের দুর্গাপূজাকে ঘিরেও তেমনি গ্রাম, শহর সবকিছুই সচল হয়ে ওঠে।

শারদোৎসব এখন সার্বজনীন শারদবাণিজ্য। কোলকাতা ও জেলাগুলিতে প্রায় ত্রিশ, পয়ত্রিশ হাজার সার্বজনীন পুজো হয়, তাছাড়া বাড়ীর পুজোতো আছেই। সার্বজনীন বা বারোয়ারী পূজাগুলোতে কমপক্ষে পাঁচলক্ষ থেকে কয়েক কোটি টাকা ধার্য হয় বাজেট হিসেবে প্রতি পুজোর জন্য। বহু মানুষের জীবিকা নির্ভর করে এর উপর। শারদোৎসব এখন নিজেই এক বিরাট শিল্প।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিমা শিল্পের, আড়াইশো বছরের পুরোনো আমাদের দুর্গাপূজা, আজও এই শিল্পে জড়িয়ে আছেন হাজার হাজার মানুষ, তাদের অনেক প্রতিমা শিল্পী ও কারিগর, অন্যরা কেউ খড় আনেন, কেউ মাটি তোলেন, কেউ বা সরবরাহ করেন প্রতিমার অস্ত্র, বস্ত্র, অলংকার, ডাকের বা শোলার সাজ ও মাথার চুল। কাঁচামাল ও উপকরণ নির্মাণের বাজারটি কোলকাতা ছাড়িয়ে, জেলায়, গ্রামে ছড়ানো। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির কাদামাটি প্রতিমা তৈরির জন্য বিখ্যাত।

এখন তো বিদেশেও দুর্গামূর্তির চাহিদা প্রচুর, তবে মাটির তৈরি মূর্তি ওজনে ভারি হওয়ায়, কাঠ, শোলা, ফাইবার, থার্মোকল ইত্যাদির মাধ্যমে তৈরি হাল্কা প্রতিমাই বিদেশে পাঠানো হয়। চন্দননগরের আলোকশিল্পের বাজার দুর্গাপুজো থেকেই শুরু। যদিও চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্যই বিখ্যাত। কিন্তু দেশে, বিদেশে দুর্গাপূজার সংখ্যাই বেশি। হাজার হাজার মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে সারা বছরই জড়িত। মণ্ডপের আলো ছাড়াও, রাস্তায় বড় বড় গেট, হোর্ডিংয়ে বর্তমান সমাজ এর নানারকম সমস্যা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সব কিছুরই প্রতিচ্ছবি, এই সব শিল্পীরা আলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।

যদিও এখন বেশির ভাগ বারোয়ারী পুজোয় থিমের ঠাকুর বা থিমের সাজের বাহুল্য বেশি, কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে শোলার সাজ বা ডাকের সাজেই বেশীরভাগ প্রতিমাকে সাজানো হত। শোলার সাজ শ্বেতশুভ্র কিন্তু ডাকের সাজ নানা রঙের রাংতা বা সিলভার ফয়েল দিয়ে তৈরি হয়। জমিদার বাড়িগুলোতে প্রতিযোগিতা হোত রীতিমত এই সাজের বাহার নিয়ে, তখন এইসব রঙ্গীন রাংতা এই দেশে পাওয়া যেত না, সুদূর জার্মানী থেকে

ডাকযোগে বা মেলে এইসব রাংতা আসত তাই এর নাম ডাকের সাজ।

হুগলীর পাণ্ডুয়া মাটির প্রদীপ তৈরির জন্য বিখ্যাত, অনেক মৃৎশিল্পী এই কাজে জড়িত, মোমবাতি, ফানুস ইত্যাদি শিল্পেও প্রচুর কারিগর জড়িত থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আতসবাজি ও রংমশাল শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র, চম্পাহাটি ও নুঙ্গি এলাকায় প্রায় ৮ হাজার ছোট বড় কারখানা আছে, বহু পরিবার তুবড়ি, আতসবাজি, রংমশাল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। হাওড়াব্রিজের কাছে মল্লিকঘাটে পুজোর কিছুদিন আগে থেকেই ফুল বিক্রেতাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়—রাণাঘাট ধানতলা ও আশেপাশের এলাকার ফুলচাষিরা অপেক্ষায় থাকে কবে মাঠগুলো সাদা কাশফুলে ছেয়ে যাবে শরতের আগমনী গেয়ে। নদিয়ার শান্তিপুর, টাঙ্গাইল, ধনেখানিতে বহু রাত পর্যন্ত তাঁতের খটাখট শব্দ শাড়ী বোনার। মালদহ, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পীদের রাতের ঘুম উধাও। কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে মুর্শিদাবাদ থেকে আসা মুসলিম কারিগররা পুজোর ছমাস আগে থেকেই ব্যস্ত থাকে জামা, প্যান্ট, ফ্রক, সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি রেডিমেড পোশাক তৈরির কাজে—যেগুলো যাবে ছোট ও বড় দোকানে, শপিংমলে, পুজোর মাসখানেক আগেই। বাঁকুড়ার টেরাকোটা শিল্পীরা তৈরি করেন অপূর্ব কারুকার্যময় প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জার নানা উপকরণ, অলংকার ইত্যাদি, দেশে বিদেশে টেরাকোটা কাজের চাহিদা প্রচুর। মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের অধিবাসীরাও পুজোর আয়োজনের প্রস্তুতি থেকে বাদ পরেন না, তাদের তৈরি কেন্দুপাতা, শালপাতার থালা, বাটি পুজোর ভোগপ্রসাদ খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই প্রসঙ্গে থার্মেকোলের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য, শুধু থালা, বাটি, গ্লাস নয়, মণ্ডপ সজ্জার উপকরণ হিসেবেও শোলার জোগান কম থাকায় পরিপূরক হিসেবে থার্মোকলের ব্যবহার হয়। যদিও পরিবেশবান্ধব নয় বলে এখন এর ব্যবহার সীমিত হয়ে আসছে। দিঘা, কাঁথি, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর—এইসব অঞ্চল থেকে কোলকাতা সহ বড় বড় পুজোর মণ্ডপ সাজাবার জন্য অনেক শিল্পীরা মাসখানেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেন। বাঁশ, কাঠ, ঝিনুক, শোলা, বেত ইত্যাদি নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় মণ্ডপের সাজ। থীমের পুজোর আয়োজনে যে কত রকমারি জিনিসের ব্যবহার হয়, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রতিমা নিরঞ্জন ও শোভাযাত্রায় বাজনদারদের ভূমিকাও কিছু কম নয়, সারা বছরের আয়ের একটা বড় অংশই এই সময় তারা অর্জন করে। বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকীর দল পুজোর ক'দিন আগে থেকেই শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে নেমে কোলকাতা ও শহরতলীর পুজোর মণ্ডপে হাজির হন। পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসে—হরেক রকম জিনিষের কেনাবেচা হয়, বহু মানুষের দৈনন্দিন রোজকার সেই মেলার ওপর নির্ভরশীল।

কোলকাতার মেছুয়াবাজারে ফলপট্টীতে শুরু হয়ে যায় ব্যবসায়ীদের ছুটোছুটি। পুজোর প্রসাদ হিসেবে ফলের চাহিদা থাকে প্রচুর। গ্রামগঞ্জ থেকে সবজির পসরা নিয়ে বিক্রেতাদের আনাগোনা ও বেড়ে যায় শিয়ালদার কোলে বাজারে। মিষ্টির ব্যবসায়ীরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েন দোকানের জোগান বজায় রাখার জন্য, কেননা শুধু পুজোর প্রসাদ নয়, তারপরই বিজয়া দশমী শুরু, চাহিদা তখন তুঙ্গে। এগুলো হোলো সাবেকি বেচাকেনার ছবি। বড় বড় শহরের শপিং মলগুলোর শারদবাণিজ্য পুজোর সময় প্রায় সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। কয়েক মাস আগে থেকেই পুজোর ডিসকাউন্ট ঘোষণা, বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি! সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে সস্তায় পুজোর বাজার করতে—শুধু শহরেই নয়, মফঃস্বলে, গ্রামে, গঞ্জেও। দেশ বিদেশের কোম্পানিগুলো পুজো উপলক্ষে কোটি কোটি টাকা স্পন্সর করে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের বিশেষজ্ঞ দলের চাহিদাও এই সময় বেড়ে যায়।

কলেজস্ট্রীটের প্রকাশনী সংস্থাগুলোও পুজোর কয়েকমাস আগে থেকেই শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করার জন্যে, দিনে রাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কাদের শারদীয়া সংখ্যা আগে প্রকাশ পাবে, তা নিয়ে। বইপ্রেমী বাঙালী পাঠকেরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন তাদের পছন্দমত পূজাসংখ্যা সংগ্রহ করার জন্য। সিনেমা শিল্পে জড়িত প্রডিউসাররাও পুজোর অনেকদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেন তাদের নতুন সিনেমা যেন পুজোর সময়েই হলগুলোতে রিলিজ করে, কেননা পুজোর ছুটিতেই সবচেয়ে বেশি দর্শকের আগমন হয়, ফলে তাদের বাণিজ্যও লাভের মুখ দেখে। যাত্রাদলের

অধিকারিরাও এই সময়ে গ্রামে, গঞ্জে, মফঃস্বল শহরে যাত্রার বায়না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, শিল্পীরাও সারা বছর রোজকারের বেশীর ভাগ অংশই পুজোর সময় অর্জন করতে পারে।

ইন্টারনেট বা ইউটিউবের যুগ শুরু হওয়ার আগে, গ্রামোফোন কোম্পানিগুলোতে পুজোর গান রেকর্ড করার জন্য চরম ব্যস্ততা শুরু হয়ে যেত, সঙ্গীত শিল্পীরাও উন্মুখ হয়ে থাকতেন পুজোর গান রেকর্ড করার জন্য কারণ এই সময়েই রেকর্ড, ক্যাসেট বা কমপ্যাক্ট ডিস্ক সবচেয়ে বেশি বিক্রি হোতো। কিন্তু এখন সারা বছরই টিভি আর ইউটিউবে লোকে গান শুনছে বিনা পয়সায়, তাই রেকর্ডের সেই চাহিদা আর নেই। তবে পুজোর সময় অনেক পুজো মণ্ডপে গানের জলসা বসে তাই শিল্পীদেরও কিছু উপার্জন হয়।

শারদোৎসবে অর্থনীতির হাল ভাল হয় না মন্দ তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক, মাত্রা ছাড়া শারদবাণিজ্যের অনৈতিকতা নিয়েও অনেক কথা, সমালোচনা! ক্রমশ বারোয়ারী পুজোর আড়ম্বর বাড়ছে—আমাদের দেশে যেখানে প্রচুর লোকে দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না সেখানে পুজোর এত চাকচিক্য, জৌলুস ও আড়ম্বর অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু। তবে এ কথাও ঠিক, পুজোয় বাংলার সর্বস্তরের ব্যবসাবাণিজ্যের অপকারের থেকে উপকারই হয় বেশী।

কিন্তু এ বছর করোনা অতিমারীর প্রকোপে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি বিপর্যস্ত, বাংলার শারদীয়া বাণিজ্যে তার প্রভাব যে খুব বেশী হবে, তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমেই প্রতিমাশিল্পীদের কথা মনে হয়। অন্যান্যবার পুজোর ৬/৭ মাস আগে থেকে কুমোরটুলী বা অন্যান্য পটুয়াপাড়ায়ে প্রতিমার বায়না শুরু হয়ে যায়, বিশেষ করে বিদেশে যে সব প্রতিমা যায়, সেগুলোর প্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু হয় কিন্তু এবছর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা প্রতিমার বায়না হয়েছে কেননা করোনার প্রভাবে সব জায়গাতেই পুজোর আয়োজন খুব সংক্ষিপ্ত, প্রতিমার সাইজও ছোট, অনেক পুজোমণ্ডপে শুধুই ঘট পুজো হবে ফলে শিল্পীদের মাথায় হাত! সারা বছরের রোজকারের বেশী অংশটাই পুজোর সময় আয় হয়। পুজোর আনুষঙ্গিক উপাচারেরও একই অবস্থা, ফুল, ফল, সবজি, মিষ্টি, সবকিছুর চাহিদাই কম থাকবে, সব জায়গায় সংক্ষিপ্ত আকারে পুজো হবে বলে। আড়ম্বর কম হলে মণ্ডপ সজ্জার সঙ্গে জড়িত শিল্পীরাও ভুক্তভোগী হবেন।

অনেক বারোয়ারী পুজোয় বা আবাসনের পুজোগুলোতে ভোগপ্রসাদ বা ফলপ্রসাদের আয়োজন কমে যাবে ফলে শালপাতা, বিভিন্ন পরিবেশ সহায়ক বস্তু দিয়ে তৈরি থালা, বাটির চাহিদাও কমে যাবে ফলে এইসব যারা তৈরি করেন তাদের অবস্থা হবে করুণ। অনেক জায়গায় বিশেষ করে বড় পুজো বা বড় বড় আবাসনগুলোতে পঙ্‌ক্তিভোজন বা কমিউনিটি লাঞ্চ হয়, করোনার আবহাওয়াতে এবার সবকিছুই বেশীর ভাগ জায়গায় বাদ পড়তে চলেছে ফলে কেটারারদের মাথায় হাত। রেস্তোরাঁ, হোটেল, স্ট্রিটফুড জয়েন্ট সব জায়গাতেই পুজোর সময় সবচেয়ে বেশী ভিড় হয় কিন্তু এবার বেশীর ভাগ লোকই ভিড় এড়াতে আর সামাজিক দূরত্ববিধি মান্য করতে বাড়ীতেই থাকবেন মনে হয়, ফলে তাদেরও অবস্থা শোচনীয়।

লকডাউনের ফলে, অনেক লোকেরই চাকরি চলে গেছে বা অর্ধেক মাইনেতে কাজ করতে হচ্ছে, দৈনন্দিন খাওয়াপরার সমস্যা মেটাতেই তাদের হিমসিম অবস্থা, পুজো আসছে বলে বাড়তি কেনাকাটা তাদের পক্ষে অসম্ভব। ফলে মার খাচ্ছে শাড়ী, গয়না, জামা, জুতো, এসবের দোকানগুলো, বড় বড় শপিং মলগুলোও দেদার ডিসকাউন্ট দিয়েও ক্রেতা জোগাড় করতে পারছে না। নিউমার্কেটের মত জায়গা, যেখানে এই সময় কেনাকাটার ভিড়ে হাঁটা দায়, সেখানে অনেক দোকান এখন বন্ধ, যেগুলো খোলা আছে, তাদের মাছি তাড়ানোর অবস্থা, টেলিগ্রাফে ছবি দেখলাম।

পর্যটন শিল্প বা ট্যুরিজম, পরিবহন শিল্প সবারই অবস্থা খারাপ। “Stay Home, Stay Safe” মানতে গিয়ে পর্যটকরা তো সব বাড়িতেই বন্দী, দুঃসাহসী কয়েকজনের পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে থাকলেও কতদূর সফল হবে সন্দেহ আছে কেননা ট্রেন, প্লেন সবইতো সংখ্যায় কম, অনিয়মিত আর ট্যুরিস্টের অভাবে হোটেল, রিসর্ট, হোম স্টে, হলিডে হোম বেশীর ভাগই বন্ধ। পুজোর সময় প্রচুর দর্শনার্থী ঠাকুর দেখবে বলে বাস, গাড়ি, ট্যাক্সি ইত্যাদি রিজার্ভ করে দল বেঁধে বেড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে

গ্রাম, মফঃস্বল, শহরতলীর লোকেরা, কিন্তু এবার লকডাউনের বাজারে তাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, তাছাড়া করোনার ভয়ে সামাজিক দূরত্ববিধি মানতে হলে আগের মত একসঙ্গে বেশী লোক কোথাও যেতে পারবে না ফলে বাড়িতে বসেই টিভিতে ঠাকুরদর্শন।

সবচেয়ে শোচনীয় দশা হবে 'দিন আনি, দিন খাই' মানুষগুলোর। রিক্সাওলা, অটোওলা, হকার এরা সবাই পুজোর মরসুমে বাড়তি রোজকারের আশায় অপেক্ষা করে কিন্তু গত ৫/৬ মাস ধরে দৈনন্দিন রোজকারই বন্ধ হবার দশা—তাই এবার পুজোর সময় সবথেকে বেশী ভুক্তভোগী হবে এই সব গরিব, খেটে খাওয়া মানুষেরা।

কতদিনে যে এই করোনার অভিশাপ দূর হবে, সবকিছু আগের মতোই আনন্দে মেতে উঠবে—সেই আশা নিয়েই আমাদের অপেক্ষা।

রাতের অন্ধকারেই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর প্রত্যাশা। খুব তাড়াতাড়ি এই অতিমারী দূর হয়ে পৃথিবী আবার আগের মতোই সুন্দর, সুস্থ, হয়ে উঠবে এই প্রতীক্ষাতেই দিন গোনা।

ধাঁধাঁর উত্তর —

১. ফুলবাগান
২. পঞ্জাব পূর্ব / পশ্চিম
৩. নেপালের বাগমতী
৪. মিজোরাম
৫. শাখামৃগ / বাঁদর

দুটি পথ এবং তাদের সম্পর্ক

ডঃ অসীম দাশগুপ্ত
এফ ই- ১৪৫

আমার জীবনে দুটি পথ সামনে এসেছে। তবে, এই পথ দুটি পরস্পরবিরোধী ছিল না, বরং ছিল সম্পর্কিত। ছাত্রাবস্থায় আমার সামনে ছিল প্রধানত একটি লক্ষ্য—একটিই পথ। তা ছিল অর্থনীতি বিষয়টিকে ভালোভাবে জানা এবং, সুযোগ পেলে, এই অর্থনীতিতে অধ্যাপনার দায়িত্ব নেওয়া। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর স্তরে আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব পরিশ্রম করতে, বিষয়টি জানার লক্ষ্যে। পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত হয় (১লা আগস্ট, ১৯৬৭), তখন লক্ষ্য করি যে আমি প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছি, সমস্ত স্বর্ণপদকগুলি অর্জন করে। এছাড়াও জানান হয়, অর্থনীতিতে মোট নম্বরের নিরিখে সেই সময়ে সর্বোচ্চ (রেকর্ড) নম্বরটিও আমি অর্জন করতে পেরেছি। তখন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং এছাড়াও অন্যতম অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন অম্লান দত্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য। এছাড়াও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পড়াতে আসতেন অধ্যাপক অমিয় বাগচী এবং ভারতের রাশিবিজ্ঞান সংস্থার (ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউট) অধ্যাপক নিখিলেশ ভট্টাচার্য। পরীক্ষার ফল জানার পরে একটি আনন্দজনক বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয় যে, পনেরো দিনের মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিতে পারি। অনেকগুলি অর্থনীতির বিষয় পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলা হয়েছিল অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের গণিতশাস্ত্রটিও পড়িয়ে দিতে। যেদিন প্রথম পড়ানো শুরু করি, একটি বিষয়ে স্থির চিন্তা করেছিলাম যে আমাকে এমনভাবে পড়াতে হবে— ধারাবাহিকভাবে বোর্ড ব্যবহার করে—যাতে শ্রেণীকক্ষের একেবারে শেষ কোণে বসা ছাত্রটির কাছেও আমি পৌঁছতে পরি। প্রথমদিনের ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ১৩০ জন—পরেরদিন দেখি, সেই সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। পরে শুনেছিলাম, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ক্লাস শুনতে আসছে। ক্লাসে জায়গা না পেলে, তারা স্থান করে নিত জানলার ধারে। ক্লাসের আগে আমি প্রস্তুতি নিতাম এমনভাবে, যাতে সহজভাবে বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। পড়ানোর ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ, তাদের ভালোলাগা আমাকে বারংবার উৎসাহিত করেছে।

এইভাবে তিনবছর পড়ানোর পর সিদ্ধান্ত নিই যে গবেষণার কাজ শুরু করতে হবে। এই লক্ষ্যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়েগুলিতে সুযোগের জন্য চেষ্টা করি। দুটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়—হার্বার্ড এবং ম্যাসাচুসেটস্ ইন্সটিটিউট অপ্ টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এমআইটি যাওয়াই স্থির করি এবং ওরা আমাকে উইড্রো উইলসন্ ফেলোশিপ প্রদান করে। এই গবেষনার প্রস্তুতি হিসেবে ষোলোটি বিষয়ে পাঠদান করা হয়, এবং পরীক্ষাও হয়। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন নোবেলজয়ী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল্ স্যামুয়েলসন এবং রবার্ট সোলো। এই ষোলোটি বিষয়ের মধ্যে পনেরোটিতে আমি 'এ' গ্রেড অর্জন করি, এবং একটিতে 'এ মাইনাস'। এইসময় আমাকে সুযোগও দেওয়া হয়, গবেষনা করার সঙ্গে সঙ্গে চাইলে কাছাকাছি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেও পারি। আমার যে ছাত্র ভিসাটি ছিল, তার ভিত্তিতে সেই সময় দেড় বছর পড়ানোও যেত। নিকটবর্তী বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়ানোর সুযোগও পাই। ওখানে পড়ানোর অভিজ্ঞতা আমার কাছে ইতিবাচক। ওখানকার নিয়ম অনুযায়ী অধ্যাপকদের পাঠদানের মূল্যায়ন করার সুযোগ দেওয়া হয় ছাত্র-ছাত্রীদেরই। নম্রতার সঙ্গে বলছি, আমাকে সেই বছরের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

আমেরিকা থেকে গবেষনার কাজ শেষ হওয়ার পরে যখন ফিরে আসব, তখন আমার সামনে ছিল তিনটি বিকল্প। এক, ওখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো। এছাড়া বিশ্বব্যাংকও আমন্ত্রণ করেছিল ওখানে যোগ দিতে। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিই যে তৃতীয় এবং সঠিক বিকল্প হিসেবে ফিরে যেতে হবে আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতায়, যেখান থেকে ছুটি নিয়েই আমি গবেষণা করতে বিদেশে এসেছিলাম। সেখানে কিছুদিন পাঠদান করার পরে আমি আবার ফিরে আসতে পারি আমেরিকায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করে, আগের মতই ভালো লাগতে শুরু করে।

এই সময় ১৯৭৭-৭৮ সালে এ-রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচিত হয়। তখন সরকারের অর্থমন্ত্রী ডাঃ অশোক মিত্র আমাকে আমন্ত্রণ জানান, গোটা সরকারের আর্থিক সমীক্ষাটি লেখার দায়িত্ব নিতে—যা রাজ্য বাজেটের সঙ্গে পেশ করা হয়। ফলিত অর্থনীতিতে কাজ করার সেটাই আমার প্রথম সুযোগ। প্রায় ১২টি অধ্যায় এবং ১৪০টি সারণি সমেত এই লেখা রচনা করার সময় সরকারের প্রতিটি দপ্তরেরই আধিকারিকদের সহায়তা আমি পেয়েছিলাম। তারপর অনুরোধ করা হয়, প্রতি বছরই এই লেখাটি লিখতে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একাধিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়, কোথাও সদস্য হিসেবে এবং কোথাও সভাপতি হিসেবে। সর্বোপরি, রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও মনোনীত করা হয়। এই সময় রাজ্যের প্রতিটি জেলা সফর করে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার কাজও শুরু করি। এই প্রত্যেকটি কাজই ছিল অবৈতনিক এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজটিও চালিয়ে যেতে থাকি।

এরপর ১৯৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসে আমাদের পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)র রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য কমিটিতে আমাকে মনোনীত করা হয় এবং ১৯৮৭ সালের শুরুতেই দলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। তখনও পর্যন্ত এর বেশি কিছু বলা হয়নি। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করার পরেই জ্যোতি বসু মহাশয় ডেকে জানান যে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও উন্নয়নমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই দায়িত্ব গ্রহণ করে এক মাসের মধ্যেই আমাকে রাজ্য বাজেট পেশ করতে হয়। এরপর থেকে টানা চব্বিশ বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করেছি। এর সঙ্গে জাতীয় স্তরে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়, সেখানে আমাকে দু'বছরের সময়কাল ধরে সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচবার পুনঃনির্বাচিত করা হয় সভাপতি হিসেবে। এই কমিটির মাধ্যমেই রাজ্যগুলিতে করব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারও সাধিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যুক্তমূল্য কর (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বা সংক্ষেপে ভ্যাট)। এই ব্যবস্থার ফলে করের উপর করের যে বাড়তি বোঝা তা লাঘব হয়, এবং একই সঙ্গে প্রত্যেকটি রাজ্যেই করআদায়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতিও হয়। এরপরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধেই এই কমিটির পক্ষ থেকে আমরা পণ্য ও পরিষেবা কর (গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স বা সংক্ষেপে জিএসটি) এর কাঠামো প্রস্তুত করি—শুধু রাজ্যগুলির জন্যে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যও। এই নতুন কর ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল রাজ্যে যতগুলি পরোক্ষ কর আছে সেগুলোকে একটি করের মধ্যেই নিয়ে আসা, এবং তার সঙ্গে পরিষেবার উপরেও কর যুক্ত করা। অনুরূপভাবে, কেন্দ্রীয় স্তরেও ছিল একই লক্ষ্য। কিন্তু এই কাঠামো জমা দেওয়ার পরেই ২০১০-১১ সালে এ রাজ্যের নির্বাচনে আমরা পরাজিত হওয়ার কারণে আমি আর কমিটির সভাপতিত্ব করতে পারিনি। পরবর্তীকালে লক্ষ্য করেছি, এই করের রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই ধরনের করব্যবস্থা চালু রাখতে গেলে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক আস্থার প্রয়োজন, তা লঙ্ঘিত হচ্ছে বারংবার। এই প্রেক্ষিতে সমস্ত জিএসটি বিষয়টির এখন পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি।

যখন সরকারের কাজগুলির দায়িত্ব নিই, তখন সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে অনুরোধ করি যে সপ্তাহে একদিন আমি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যেতে পারি, অবশ্যই অবৈতনিকভাবে। এই অনুরোধ রাখা হয়। এইবার যখন পড়াতে শুরু করি, তখন পড়ানোর বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা যাতে গবেষণার কাজও শুরু করতে পারে—তারও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। এই লক্ষ্যে প্রত্যেক বছরেই জেলাগুলিতে প্রায়

পনেরো দিন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে সমীক্ষা করিয়ে, একাধিক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কী করে গবেষনা করতে হয়, তা শেখানোর চেষ্টা করতাম। পাঠদানের এই বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এইভাবেই দুটি পথকে—ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো এবং সরকারের দায়িত্ব পালন করা—সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেছি। তাই আমার জীবনে একটি পথ থেকে সরে গিয়ে আরেকটি পথে যাইনি। দুটি পথের মধ্যেই সম্পর্ক ও সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টাটাই করেছি। এই কাজটি সম্ভব হয়েছে তার একটি প্রধান কারণ বাড়িতে সমস্ত ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার স্ত্রী শ্যামলী, এবং তার পাশে ছিল আমার দুই কন্যা—ঈশা এবং উজানী।

(অনুলিখন - সেচ্ছাধারা দাশগুপ্ত, দৌহিত্রী)

''আজ বিশেষ ক'রে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নবব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালীর নিত্য কৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্ত্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্য বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যে আমি তার দ্বার উদ্ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব যদি দেশের লোক স্বীকার করে থাকেন, তবে আামি যেন স্বীকার করি — একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।''

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে পড়ে

এলা মজুমদার (দাশ)
এফ ই-৫০১

সারা বিশ্ব জুড়ে অদ্ভুত এক সন্ত্রাসের পরিস্থিতি এরই মাঝে আমাদের ব্লকের এই ভাবনা প্রতিবারের মত আবাসিকদের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়ে শারদসংখ্যা প্রকাশ করবার প্রয়াস এক অদ্ভুত ভাল লাগায় মনটাকে ভরিয়ে দিল।

জীবনের উজানবেলায় ছোটবেলার এক স্মৃতি ইচ্ছে হল, সবার সাথে ভাগ করে নেবার। যাঁর কথা আপনাদের শোনাব তিনি আমার ঠাকুমা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী। হঠাৎ এক সকালে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অকালে পাড়ি জমালেন অজানালোকে। তাঁর তখন তিন কন্যা, দুই পুত্র আর এক সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার অপেক্ষায়। তাঁর বড় নাতির বয়স তখন মাত্র দশ। কুলপুরোহিতকে খবর দেওয়া হল পারলৌকিক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য। তাঁর বিধান, পুত্রের মস্তক মুণ্ডন আশু কর্তব্য। এই কথা শুনে সেই ছোট্ট ছেলেটি কেঁদে আকুল। সে কিছুতেই এই কাজটি করতে পারবে না। পুরোহিতের কিন্তু একই কথা। বাড়ীর সকলেই তাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। হঠাৎ সে বলে উঠেছিল— ''আমি মাথা নেড়া করব।'' সকলে তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপরেই শিশুটি বলে উঠেছিল তার একটি শর্ত আছে, সবাই তাকে ঘিরে ধরে তার শর্ত কি জানতে উদগ্রীব। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এই ভেবে যে পারলৌকিক কাজটি তাহলে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হবে।

শিশুটি বলে উঠেছিল— ''আমি নেড়া হতে পারি কিন্তু আমার ঠাকুমাকেও নেড়া হতে হবে। সকলে নির্বাক। তার ঠাকুমা বলেছিলেন তাঁকে নেড়া করে দিতে। তাঁর কোমর ছাপিয়ে পড়া চুলের চাল আর কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি কেননা তিনি আর চুল রাখেন নি।

বহুদিন হল তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন কিন্তু চোখ বুজলেই তাঁর ছবি চোখে ভেসে ওঠে। আর এই যে আমার রেডিও শোনা সে তো তাঁরই অবদান। কত বছর হয়ে গেল রেডিও নিরলসভাবে আমার সঙ্গী। অলস মুহূর্তে কানে ভেসে আসে পুরনো সব নাম—''আকাশবাণী —খবর পড়ছি ইভানাগ, কখনো বা নীলিমা সান্যাল এইরকম আরো অনেক নাম। আর শিশুমহল— ''ছোট্ট সোনা বন্ধুরা ভাই, আদর আর ভালবাসা নাও। কি ভাল আছ তো সব?'' ইন্দিরাদির সেই মধুমাখা কণ্ঠস্বর।

আজ জীবনের উপান্তে রেডিওর মত 'চা' আমার আর এক প্রিয় বন্ধু। সেও আমার ঠাকুমার অবদান। দুপুর আড়াইটের সময় স্টোভ জ্বেলে চা করতেন আর ডেকে উঠতেন তার দেয়া আদরের নাম 'নারায়ণী' বলে। বলতেন— ''আয় একটুক চা বেশী হয়েছে তোর জন্য রেখেছি। আমি দৌড়ে তাঁর কোল ঘেঁসে বসে গরম চায়ে চুমুক দিতাম। তখন আমি আট বছরের বালিকা।

জানিনা আমার এই লেখা কার কতটা ভাল লাগবে —তাও আমার একটুকরো সুখস্মৃতি সকলের সাথে ভাগ করে নেবার বাসনা ত্যাগ করতে পারলাম না।

বুদ্ধদেব গুহ - a writer per excellence

দেবরাজ সেনগুপ্ত
এফ ই-৩৭৪

আজ আমি এমন একজন লেখকের কথা বলব, যিনি একটু অন্যধরণের বিষয়ের উপর সাহিত্য সৃষ্টি করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান সুনিশ্চিত করেছেন। হ্যাঁ, তিনিই বুদ্ধদেব গুহ—বাংলা সাহিত্যের ''দ্বিতীয় বুদ্ধদেব'' (প্রথমজন বুদ্ধদেব বসু) যাঁর বিষয় শিকার—শিকার নিয়ে ভারতের অন্যান্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি, একমাত্র বাংলা ভাষাতেই হয়েছে এবং বুদ্ধদেব গুহ এই বিষয়ের উপর সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতকীর্ত্তি হয়েছেন।

এটা ঠিকই যে বাংলা সাহিত্যে শিকার নিয়ে লেখকের সংখ্যা কম, কারণ নিজে শিকারী না হলে বা fair rules of the game না জানলে, তার সাথে হিংস্র জীবজন্তু বা বন্য প্রাণীর স্বভাব অভ্যেস বা মানসিকতার সাথে সম্যক পরিচিতি না থাকলে শিকারী হওয়া যায় না। উদাহরণ Kenneth Anderson -বুদ্ধদেবও সেই ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাংলা সাহিত্যে শিকার নিয়ে অপর যে লেখক যাঁকে বুদ্ধদেব গুহর সতীর্থ বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন লাল গোলার মহারাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী যাঁর লেখা শিকার কাহিনীগুলিও সমভাবে চিত্তাকর্ষক (একবার কাজী নজরুল ইসলাম এই লালগোলার রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন)।

তবে বুদ্ধদেব গুহ মানেই যে শিকার সংক্রান্ত রচনা ঠিক তা নয়, তিনি সামাজিক বিষয় ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর লিখে গেছেন সেই গল্প উপন্যাস গুলিও চিত্তাকর্ষক তবে শিকারের উপর রচনাই তাঁকে খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের নানা জায়গা, জঙ্গলমহল, পালামৌ, ওড়িশা ইত্যাদি অঞ্চলের বনে জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করে তিনি ঠিক Jim Corbett এর মতই শুধুমাত্র জঙ্গল বা বন্যজন্তু নয়, সেখানকার সাধারণ মানুষের কথাও মর্মস্পর্শী ভাবে তুলে ধরেছেন, ''কোয়েলের কাছে'' বা ''মাধুকরী'' এক একটি Masterpiece.

তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ''ঋজুদা'' বাংলা সাহিত্যিক শিকারী হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। টেনিদা, ফেলুদা, ঘনাদা, ব্রজদা ইত্যাদি ''দাদা'' দের ভিড়ে হারিয়ে যেতে সে আসেনি এবং তার সাগরেদ রুদ্র (যেমন কাকাবাবু আর সন্তু বা ফেলুদা আর তোপসে) দুজনেই রেখেছে স্বকীয়তার স্বাক্ষর।

এবার আসি মানুষ, বুদ্ধদেবের কথায় Chartered Accountant বুদ্ধদেব ছিলেন aristocrat ধনী পরিবারের সন্তান, শরীরে নীল রক্ত থাকা সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুকে, সরল ও উদার, সবাইকে কাছে টেনে নেবার ক্ষমতা তঁর পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তিনি ছিলেন এই অধমের College– St. Xaviers এর প্রাক্তন ছাত্র এবং তারাশঙ্কর ও গজেন্দ্র কুমারের পর তৃতীয় Xaverian যিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেন ও বাকীটা ইতিহাস। Jack of all trades" নয় "epitome of versatility" তাঁর ক্ষেত্রে খুবই মানান সই। এখানে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু এবং বাংলা সাহিত্যের আর এক জীবন্ত কিংবদন্তী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথাই তুলে ধরছি।

''বালিগঞ্জের বিরাট বাগান বাড়িতে থাকত ওরা'' (বালিগঞ্জের মানে তখনকার দিনে ধনী অভিজাতদের আবাসস্থল) ''ওরকম সুপুরুষ চেহারা আমাদের মধ্যে কারুর ছিল না, এছাড়া ও খুব ভালো খেলোয়াড় ছিল, খেলত একসময় (প্রয়াত) চুনী গোস্বামীও বুদ্ধদেবের ক্যাপ্টেন্সিতে খেলেছে। নানান গুণের অধিকারী ছিল বুদ্ধদেব যেমন শিকারের হাত, তেমনি গানের গলা, অপূর্ব আঁকার দক্ষতা ও অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন (লেখক)। আমি (শীর্ষেন্দু) ইয়ার্কি মেরে বলতাম, 'তুমি তো সব জায়গাতেই প্রশংসা মেরেছো আমাদের তো একটাই মোটে খাতা।"

প্রকৃতিপ্রেম ও জঙ্গল সংক্রান্ত বিষয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করায় বুদ্ধদেবের অনুপ্রেরণা ছিলেন বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই ''ঋজুদা'' series এর একটি উপন্যাস আফ্রিকার বন্য পটভূমিকায় রচিত ''রুআহা''য়

নায়িকা তিতির সেন রুদ্রকে বলছে, 'বিভূতি ভূষণ একবারও আফ্রিকায় না গিয়ে ''চাঁদের পাহাড়ের মতো উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু তোমরা বার বার এসেও পারবে না।"

এছাড়াও ''খাদ্য-খাদক" শব্দটি তিনি তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণ ভাবে খাওয়া দাওয়ার সাথে যুক্ত। ''অ্যালবিনো" উপন্যাসটিতে ঋজুদাকে গোয়েন্দার ভূমিকাও পালন করতে হয়েছে।

বুদ্ধদেব সৃষ্ট অপর চরিত্রটির নাম ''ঋজু" যা বিভূতি ভূষণের ''অপুর" মতো বুদ্ধদেব নিজেই। এছাড়াও গোপাল (মিহির সেন ও শিকারী), ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাস, ভুতো এবং মহম্মদ নাজিম (নাজিম সাহেবের মতো কয়েকজন real life character ও তাঁর গল্প উপন্যাসে স্বকীয়তায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ঋতু গুহ ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী এবং রাসবিহারী অঞ্চলের বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র ''দক্ষিণী" তাঁর শ্বশুর বাড়ী।

আমার St. Xaviers College এর খ্যাতকীর্ত্তি প্রাক্তনীদের মধ্যে যাঁদের যাঁদের আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা অর্পণ করি তাঁদের মধ্যে অন্যতম নাম ''বুদ্ধদেব গুহ"।

Sudoku

Sudoku is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle. Each Sudoku puzzle is a 9x9 grid with some numbers filled in. The object is to deduce the numbers that go in the blank cells. The puzzle is solved when each cell in the grid has a number from 1-9, and each number appears exactly once in each row, each column, and each of the nine 3x3 boxes. Here we present 4 Sudoku collected from Internet sources. Try to solve it.

	2		6		8			
5	8				9	7		
				4				
3	7					5		
6								4
		8					1	3
				2				
		9	8				3	6
			3		6		9	

			6			4		
7					3	6		
				9	1		8	
	5		1	8				3
			3		6		4	5
	4		2				6	
9		3						
	2					1		

2			3					
8		4		6	2			3
	1	3	8			2		
				2		3	9	
5		7				6	2	1
	3	2			6			
	2				9	1	4	
6		1	2	5		8		9
					1			2

	2							
			6					3
	7	4		8				
					3			2
	8			4			1	
6			5					
				1		7	8	
5					9			
							4	

Editorial Team

Sudoku Solution

on Page no. 111

একটি পারিবারিক উপকথা

পূর্ণিমা সেন
এফ ই-৩৩৩

আমার শ্বশুরবাড়িতে একটি গল্প বহুকাল ধরেই প্রচলিত। একটু অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত, নাকি মুখে মুখে চলে আসা কল্পকথা জানি না। যেমন শুনেছি তেমনি লিখছি। জে. কে. রাওলিং এর হ্যারিপটার সিরিজের পার্থিব এবং অপার্থিব জগতের মাঝামাঝি যাদুজগতে বসবাসকারীদের গল্পগুলি যেমন মনোগ্রাহী হলেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি আমার, তেমনি এই গল্পটিও।

বিয়ের পর একটি কথা প্রায়ই শুনতাম 'কামুসেনের পেত্নি'। একটি যৌথ পরিবার থেকে আরেকটি যৌথ পরিবারে এসে ভালই লাগছিল। সারাক্ষণই আপন আর 'তুতো' ভাইবোনদের হাসিঠাট্টা, খুনসুটি, আড্ডাবাজি। তবে আমাদের বাড়ির সঙ্গে একটাই তফাৎ। আমাদের ভাইবোনদের মত চটপটে নয়, খানিকটা আলসে। বাড়ির বড়মেয়ে, রোগা, লম্বাপাত্‌লা বলে এ বাড়িতে এসে ও আমি সবকিছুতেই এগিয়ে যেতাম। যেমন, একটা জিনিস দূরে রয়েছে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে এলাম। গল্পের তোড়ে, টেবিলের ওপর রাখা পকোড়ার প্লেটটা নিয়ে আসা বা খালি চায়ের কাপটা রাখার জন্য কেউই নড়ছে না। আমি বসে বসেই হাতটা বাড়িয়ে প্লেটটা নিয়ে এলাম বা কাপটা টেবিলে রেখে দিলাম।

অমনি, ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে আমার বরের মন্তব্য, 'কামুসেনের পেত্নি? ''কি আমি পেত্নি?'' ''আরে না, না, আমি তো পত্নী বললাম।'' ভাইবোনেরা সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরেছে 'রাঙ্গাদা পত্নী বলেছে। তুমি তো ওর বউ।'' আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনেছি 'পেত্নি'। আরেকদিন এরকম হয়েছে। আসরে ছিলেন মেজদি, আমার বড় ননদ। আমি তাকেই ধরেছি ''আমাকে পেত্নি বলে কেন তোমার ভাই? কামুসেনটিই বা কে? তোমার ভাই এর ডাকনাম, ভালো নাম কোনোটাই কামু নয়?'' মেজদি অমনি তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, ''দূর! পেত্নি বলবে কেন? পত্নী বলেছে। কামুসেন আমাদের একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী তোমার মত সুন্দরী ছিলেন। তাই ভাই তোমাকে কামুসেনের পত্নী বলে।'' গোঁজা মিলটা আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পেরেছি। আমি তো আর এমন কিছু সুন্দরী নই।

এখন থেকে আমার বর একটু সমঝে চলতে লাগলেন। আমার সন্দেহটা কিন্তু কাটল না। 'কামুসেন' না হয় বোঝা গেল কিন্তু 'পেত্নির' রহস্যটা ভেদ করতেই হবে। সেই সুযোগ একদিন এসেই গেল। পুজোর পর সবাই মিলে শিলঙ বেড়াতে গেছি বড়পিসি শাশুড়ির বাড়িতে। এই বয়সেও পিসিমা অপূর্ব সুন্দরী। একমাথা ধবধবে সাদা কোঁকড়ানো চুল, টকটকে ফরসা গায়ের রঙ, কাটাকাটা নাক-চোখ-মুখ। তেমনি কর্মঠ আর সুগৃহিনী। পড়াশুনোয় খুব ভাল ছিলেন। সেকালের মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি পাওয়া ছাত্রী। বয়সকালে আসামের হাফলঙ স্কুলে পড়িয়েছেন। পিসামশাই ওখানকার পুলিশ অফিসের হেডক্লার্ক অর্থাৎ বড়বাবু ছিলেন। পিসিমা খুব গুছিয়ে গল্প করতে পারতেন। প্রায় সন্ধ্যাতেই তাঁর ঘরে পিসামশাই ছাড়াও তাঁদের ছেলে, বৌমা ও ভাড়াটেদের কেউ না কেউ থাকতেন।

আমরা যাবার পর পিসিমার ঘরে একদিন আড্ডা বসেছে। যেমন হয়ে থাকে পরিবারের অনেক লোক এক জায়গায় হওয়াতে নানারকম পুরোনো ঘটনা, দেশের বাড়ির কথা, নিজেদের ছেলেবেলার কথা, আত্মীয়দের মধ্যে কারুর উল্টোপাল্টা কাজ, বোকামির কথা— সব গল্পই হচ্ছে। একজনের কথার সূত্র ধরে আরেক জন কিছু বলছে। বেশ মজা লাগছিল শুনতে। বয়স্করা বলছিলেন তাঁদের আদি বাড়ি জয়ন্তিয়া পাহাড়সংলগ্ন শ্রীহট্টের শঙ্করপুর গ্রামের কথা। ''পুবের বাড়ির অমুক'', উত্তরের বাড়ির তমুক'' ইত্যাদির গল্প চলতে চলতে এসে গেল ''দক্ষিণের বাড়ি'' অর্থাৎ আমার শ্বশুরবাড়ির কথা। এইসব বিভিন্ন বাড়ির লোকেরা ছিলেন জ্ঞাতি। বহুবছরে বংশ বড় হতে হতে এক বাড়িতে জায়গা না হওয়ায়, প্রকাণ্ড বাস্তুভিটায় মাঝখানে

খোলা জায়গা রেখে চারদিকে ঘর তুলে ওরা বসবাস করছিলেন। এত বছর পরেও সব জ্ঞাতিরা মিলে বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পারিবারিক দোলদুর্গোৎসব একসঙ্গেই পালন করতেন। তাই দেশভাগের আগে পর্যন্ত অনেকেই দুর্গাপূজার সময় দেশের বাড়ি যেতেন। আমার শ্বশুরমশাই দেশভাগের আগের বছরের দুর্গাপূজার গল্প করছিলেন। হঠাৎ আমার দাদাশ্বশুরের সঙ্গে ঘটা একটা মজার গল্প শোনা গেল। বড়দি, বড়পিসিমার মেয়ে সেবার পুজোয় মামাবাড়ি গেছেন। সঙ্গে বছর বারো তেরোর একটি কাজের মেয়ে। বড়দি কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন আর জামাইবাবু মস্ত বড় সরকারি চাকুরে। মেয়েটি সেই অর্থে বড়দির ''কাজের মেয়ে'' বা ঝি ছিল না। ঘরের কাজের জন্য আলাদা লোক ছিল। মেয়েটি বড়দির সঙ্গে সঙ্গে থাকত, টুকটাক কাজ করত, তাঁর কাছে পড়াশুনা, একটু আধটু সেলাই, ঘর গোছানো শিখত। তখনকার দিনে অনেক দুঃস্থ মা-বাবাই উঠতি বয়সের মেয়েদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন ভদ্রপরিবারে নিজের মেয়েটিকে রাখা অনেক নিরাপদ মনে করত। যা হোক শঙ্করপুর বাড়িতে সবাই নিজেদের মধ্যে স্থানীয় ভাষাতেই কথা বলত, মেয়েটি অনেক কথাই বুঝতে পারত না। অতএব ভাষাবিভ্রাট অনিবার্য। একদিন দাওয়ায় দাদু বসে আছেন। বাড়ির ছোটদের সঙ্গে মেয়েটি উঠোনে, এক্কাদোক্কা খেলছে। দাদু ওকে বললেন, ''কুসুম, ধারি খান আন''। ধারি হচ্ছে বাঁশের বোনা এক ধরণের চাটাই বা মাদুর। পেতে বসা যায়, আবার এর উপর রেখে কোন কিছু রোদে শুকোতে দেয়া যায়। কুসুম হয়তো খেলার নেশায় দাদুর কথা শোনে নি। এবার দাদু বেশ জোরে ডাকলেন, ''ওরে কুসুম ধারি খান আন।'' বুঝুক আর না বুঝুক 'ধারি' কথাটি কুসুম শুনতে পেয়েছে। আর যায় কোথায়। মেয়ের কি কান্না! ''মাসিমা দাদু আমাকে ধাড়ি বলেছে আমি কি ''ধাড়ি মেয়ে?'' বড়দি ওকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধারিটি দেখাতে তবে মেয়ের মুখে হাসি ফুটল।

এসব গল্প শুনতে শুনতে আমার খেয়াল হল কামুসেনের গল্পটা শোনার এই তো সুযোগ। বললাম, ''পিসিমা, কামুসেনের পেত্নির ব্যাপারটা কি গো?'' তিনি অবাক হয়ে বললেন, ''সে কি! তুমি জানো না? এটা তো সেন বংশের সবাই জানে।''

কামু বা কামাখ্যা সেন ছিলেন সেনবংশের একজন পূর্বপুরুষ। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। শিক্ষিত, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান যুবক। অত্যন্ত সৌখিন এবং অবস্থাপন্ন। পুরুষানুক্রমিক জায়গা জমি সম্পত্তি ছাড়া ও জয়ন্তিরা পাহাড়ের ঢালে চা-বাগানগুলির কয়েকটির শেয়ার ছিল। সেই সূত্রে চা-বাগানের সাহেব মালিক ও ম্যানেজারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ওঠাবসা ছিল। বাড়িতে ছিলেন শুধু একজন বিধবা পিসিমা। ভদ্রলোকের শখ ছিল শিকার আর ঘোড়ায় চড়া। প্রায়ই ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতেন শিকার করতে। বাঘ, ভাল্লুক নয়, ছোটখাটো খরগোশ, বুনোহাঁস ইত্যাদি মেরে আনতেন।

একদিন বেখেয়ালে তিনি জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে চলে গেছেন। দেখলেন, দূরে বড় একটা গাছের তলায় বসে একটি মেয়ে কাঁদছে। আরো কাছে গিয়ে দেখেন বছর ষোলোর মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। তাঁকে দেখে ওর কান্না আরো বেড়ে গেল। ওঁর নানাপ্রশ্নের উত্তরে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে শুধু এটুকুই বলল যে পথ হারিয়ে সে এখানে এসে পড়েছে আর কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারছে না। কি যে হল কামুসেনের! নামধাম, পরিচয় কিছু জানার চেষ্টা না করেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটিকে নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন।

বাড়িতে নিজের লোক বলতে পিসিমা আর কাজের লোকেরা। মেয়েটি মিষ্টি চেহারা, ব্যবহার আর লক্ষ্মীমন্ত স্বভাবের গুণে দুদিনেই সবার মন জয় করে নিল। কামুসেনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পিসিমা ওকে বৌমা বলে বরণ করে নিলেন।

খুব সুন্দরভাবে সংসার করছে নূতন বৌ। কামুসেনের বাইরে ঘোরা অনেক কমে গেছে। পিসিমা নিশ্চিন্তমনে নিজের পূজা-অর্চনা নিয়ে সময় কাটান। ঘরের কাজ, বিশেষতঃ মাছ কাটা, রান্নাবান্না করতে নূতন বৌ এত ভালবাসে যে কাজের মাসির ও অখণ্ড অবসর। একদিন হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে ওর চক্ষুচড়কগাছ। বৌমা উনুনে নিজের পা ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেটি দাউদাউ করে জ্বলছে আর কড়াতে মাছ রান্না হচ্ছে। জানালা দিয়ে ইয়া লম্বা হাত বের করে বাগান থেকে লেবু পেড়ে এনে কেটে রাখছে! ঝি পড়িমরি ছুটে গিয়ে কামুসেন আর পিসিমাকে সব বলল। ওঁরা চুপি চুপি এসেও কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। তবে সন্দেহের

কাঁটা দুজনের মনেই খচ্ খচ্ করতে থাকল। কামুসেন একদিন স্বচক্ষেই ব্যাপারটা দেখলেন। মনস্থির করে ফেললেন তিনি। পরদিনই, যেমন আগে মাঝে মাঝে বৌকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, তেমনি ওকে নিয়ে বেরোলেন। একথা সেকথায় ওকে ভুলিয়ে সোজা ঘনবনের মাঝে ঐ গাছের নীচে ওকে নামিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মেয়েটির কান্নাভরা মিনতি তখনো শোনা যাচ্ছিল।" আমাকে ফেলে রেখে যেও না। আমি কোন ক্ষতি করব না তোমাদের।" কামুসেন যখন কিছুতেই ফিরলেন না, তখন অভিশাপ দিল, ''তোমার বংশ নির্বংশ হবে।"

মেয়েটি নাকি ডাইনি ছিল। এরা মানুষের রূপ ধরে মানুষের সংসারেই থাকতে চায়, কিন্তু কোনো মানুষ হাত ধরে নিয়ে না গেলে এরা নিজেদের গণ্ডী ছেড়ে বেরোতে পারে না সত্যি মিথ্যা জানি না।

তবে কামুসেন আর কোনদিন বিয়ে করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ি খালিই পড়ে থাকে। এতো বছর পর তার পোড়োবাড়ি জঙ্গলে ঢেকে গেছে। ভয়ে কেউ ওদিক মাড়ায় না। আমার দাদাশ্বশুরও নাকি ছেলেবেলা থেকেই কামুসেনের ভিটেকে ওভাবেই দেখে আসছেন।

Books

THE NUMBER ONE BEST SELLER

IDOLS
by **Sunil Gavaskar**

Category : Sports
Edition : Paperback
Publisher: Rupa
Year of publication : 1983
Pgs. : 286; Price : 95/-

Reviewed by **Debraj Sengupta**, FE 374

Sunil Manohar Gavaskar, like his elegant cover drives, displayed his flamboyance with the pen in his book IDOLS, where he has paid homage to 32 cricketers from different test playing nations who have been superstars in their heydeys.

It is not only their statistics that he has highlighted but also their prowess and robust profiles in and outside the field. This list includes great players like Gary Sobers, Clive Lloyd, Viv Richards along with Andy Roberts, the Chappell brothers and fearsome pace bowling duo Lillie and Thompson ; the four great all rounders Ian Botham, KapilDev, Imran Khan and Richard Hadlee and the two great wicketkeepers Rodney Marsh and Allan Knott. Even our Syed Kirmani features in the list. Gavaskar also mentioned his teammates - the four great Indian spinners Bedi, Prassanna, Chandrasekhar and Venkatraghavan who were his illustrious contemporaries.

IDOLS is a book for cricket lovers to cherish and it is a great coincidence that this was published in the same year when India won the World Cup for the first time.

I would recommend to read this book.

ইয়েতির ডাক

আশিস সরকার
এফ ই- ২০৩

চাকরির শেষে বাড়িতে বসে কি করব তাই ভাবছি। পেপারে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রজেক্টে একটা ভালো চাকরি। কিছু না ভেবেই অ্যাপ্লাই করে দিলাম। কদিন পরে ডাকও পেলাম। দিল্লীতে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে ইন্টারভিউ। সেখানেও উতরে গেলাম। পোস্টিং পেলাম ভুটানে। থিম্পুতে অফিস। আমার পোস্ট ইলুম্যানেটারের। সবার উপরে একজন জাপানি ডিরেক্টর। তার পর তিনজন সহঃ ডিরেক্টার। একজন চীনা, একজন জাপানি আর একজন ভারতীয়। আমরা ইলুম্যানেটার আছি পাঁচ জন, আমাকে ধরে দুজন ভারতীয় একজন কোরিয়ান মহিলা একজন চীনা আর পঞ্চম জন বাংলাদেশী মহিলা। আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে পরিচয় হোল। সবাই উচ্চ শিক্ষিত আমাকে বাদ দিয়ে। আমার কাজ হোল বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ঘুরে ঘুরে লোনের পর্যালোচনা করা। বাংলাদেশী ভদ্রমহিলা অর্থনীতিতে ডক্টরেট। ব্যাঙ্কের উন্নয়ন পর্যালোচনা করেন। অন্যান্যরাও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

ভুটানকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষিণে নেপালী প্রধান ফুনসিলিং। এই এলাকায় লোকসংখ্যা বেশি। কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে। ধান আলু সবজি এবং ট্রেডিং প্রধান উপার্জনের রাস্তা। পশ্চিমে সামথার দুপ্পা। বাসিন্দা মোটাপালী আর ডুপ্পা। চাষ আবাদ আর ফরেষ্ট প্রধান উপার্জনের রাস্তা। পূর্বে চিমাকোঠে। এখানে ভূটিয়া আর মেচ জাতি। এরা ট্র্যাডিশনাল তাঁতের কাজে পারদর্শী। উত্তরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। এখানে তিব্বতী আর দুপ্পারা বাস করে। দেশের মাঝখানে পারো উপত্যকায় সাধারণত ভুটানীরা বাস করে। এরা যথেষ্ট সম্পন্ন। চমৎকার কাঠের বাড়ি কত রকম ফুলের বাহার। বিভিন্ন ধরনের খাবার। আমাদের অফিস রাজধানী থিম্পুতে। থাকি পিছনে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে। বাংলাদেশী ভদ্রমহিলা ডঃ আনোয়ারা আমার প্রতিবেশী। অফিসের পর তার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটে। তার এক মেয়ে রাজশাহীতে ডাক্তার। তিনি অত্যন্ত সিরিয়াস। বিভিন্ন মহিলা উন্নয়ন প্রজেক্ট ঘুরে ঘুরে দেখেন। তাদের প্রশংসা করেন। এইভাবে আমার সময় কেটে যায়।

বিভিন্ন জায়গায় গেলেও নর্থে যাওয়া হয় নি। এবার নর্থে যাবার অর্ডার পেলাম। থিম্পু থেকে প্রধান শহর দ্রাধুতে যেতে একদিন সময় লাগে। আমার সঙ্গে আনোয়ারা ম্যাডাম চললেন। থিম্পুর বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতি বদলাতে লাগলো পাইনের বন। দুপ্পাদের কাঠের সুন্দর কারুকাজ করা বাড়ি। আপেল কমলা চেরীর বাগান, ঝকঝকে রাস্তা, নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। আলু জব আর ধানের স্লপ ক্ষেত। ঘন পাইন দেবদারু আর রডোড্রেনডনের গাছের জঙ্গল। আস্তে আস্তে প্রকৃতি বদলাতে লাগল। ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ। তারপর আরও উপরে ঘন কুয়াশায় ঢাকা ভেজা মাটিতে কিছু ছোট ফার্ন জাতীয় গাছ আর অজস্র জংলী ফুলের গাছ। এরপর শুরু হল বরফের রাজত্ব। ঘন বরফের মধ্যে আমরা ছোট্ট একটা ভুটানী / তিব্বতী শহর এসে পৌঁছুলুম। শহরের নাম দ্রাঞ্চু।

দ্রাঞ্চু জায়গাটা অসাধারণ। উত্তরে একটা বিরাট হিমবাহ। একটা বরফের নদী নেমে এসেছে। আর তিন দিক গভীর পাহাড় আর ঘন জংগল। ওপারেই তিব্বতের লাসা ভ্যালি। পূবে সকেতং ফরেষ্ট। যাকে ইয়েতিদের অভয়ারণ্য বলা হয়ে থাকে। ওর ওপারেই ভারতের অরুনাচল প্রদেশের তাওয়াং অঞ্চল।

ছোট্ট লোকালয়। বাসিন্দারা দ্রুপ্পা (তিব্বতি) সম্প্রদায়ের। ধান কোদো বার্লি আলু চাষ করে। ঈয়াক (চমরী গাই) পালন উপার্জনের আরেক উৎস। এদের হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট উডক্র্যাফ্ট বিদেশে এক্সপোর্ট হয়। সবারই কাঠের অথবা স্লেট পাথরের বাড়ি। সাজানো গোছানো। অতিথি বৎসল। সবচেয়ে আশ্চর্য শিক্ষার ভাগ নব্বই পারসেন্ট। গ্রামের মাঝখানে একটা গুম্ফা, তার পাশে রাজার অফিস, একটা স্কুল একটি ডিসপেনসারি।

এদের একজন রাজ প্রতিনিধি আছেন। তিনি

শাসকও। পাথর ও কাঠের দোতালা বাড়ি। তিনি সমাদর করে আমাদের তার বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। দামি কার্পেট পাতা কারুকার্যকরা বসবার ঘর। তাঁর মেয়ে এল। অবাক করে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলা শুরু করল। মেয়েটি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে এম এ পড়েছে। এখানে স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস। আমাদের গুম্ফায় নিয়ে গেল। বিরাট স্লেট পাথরের গুম্ফা। ভিতরে বিরাট বিরাট ফেস্কো। মাঝখানে সোনার বুদ্ধ মূর্ত্তি। দুপাশে পদ্ম সম্ভব আর বর্তমান ভুটানের পূর্বপুরুষের মূর্ত্তি। গুম্ফার মাঝখানে একটা বিরাট কাঠের বাক্সের মধ্যে একটা ইয়েতির সংরক্ষণ করা দেহ। শুনলাম পৃথিবীতে মাত্র তিনটি ইয়েতির দেহ পাওয়া গেছে। দুটো চীনের তিব্বতে আর এই একটা। আমরা প্রধান লামাকে প্রণাম করলাম।

সেদিন আমরা সরকারি গেষ্ট হাউসে কাটালাম।

পরদিন আমাদের মিটিং শুরু হল। এই এলাকায় মাত্র দুটি ব্যাঙ্ক। তাদের কাছে রিপোর্ট নিলাম। দেখলাম লোনের রিকোভারী খুবই ভালো। ম্যাডামের কাছে একই কথা শুনলাম। এখানকার মহিলা সেল্ফ হেল্প গ্রুপের রিকোভারী একশ ভাগ। আমাদের দুজনকে চমরি গাঈ-এর চামড়া দিয়ে তৈরি জ্যাকেট আর মৃগনাভী দিল।

গুম্ফার বাইরে একটা ছোট জায়গায় একটি সুইডিস মহিলা দল তাঁবু ফেলেছে। তারা সাকেতং অভয়ারণ্যে কিছু দামি গাছের সন্ধানে এসেছে।

এই অঞ্চলের আর একটা অত্যন্ত দামি শিকড় জাতীয় গুল্ম হয় যার এক্সট্রাক্ট শক্তি বর্ধক হিসাবে কাজ করে। বিদেশে খুব দামে বিক্রি হয়। যা সাকেতং ফরেষ্টের উপরের দিকে যেখানে সারা বছর মেঘের রাজত্ব সেখানে পাওয়া যায়। ঐ সব এলাকায় এখনও ইয়েতি দেখা যায়। এখানে একটা বিশ্বাস আছে যে ইয়েতির হাতে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। এখানে কিছু ইয়েতির আক্রমণে আহত লোক দেখা যায়।

সেই সুইডিস মহিলা দল সম্ভবতঃ ইয়েতির সন্ধানে এসেছে যদিও মুখে বলছে জেনসিং গুল্ম নিয়ে পরীক্ষা করতে এসেছে। এখানকার শাসনকর্তার মেয়ে ওদের সঙ্গে যাবে। ওর নাম ডোমা। আমি ডোমার সঙ্গে খাতির করে নিলাম। শাসক মারফৎ অনুরোধ করলাম আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে। প্রথমে না করেও তারা রাজি হয়ে গেল। যেহেতু তিন / চারদিন লাগবে সেইজন্য ম্যাডাম ফিরে গেলেন থিম্পুতে। ঠিক হোল পরদিন আমরা নয় জনের মত রওনা হব। মালবাহক ও গাইড আলাদা।

পরদিন খুব সকালে আমরা রওনা হলাম। পাঁচ জন সুইডিস মহিলা, ডোমা ও আমি, একজন পথপ্রদর্শক একজন শিকারী আর ছজন মালবাহক। সাত/আটটি ঘোড়া ও খচ্চর। জুলাই মাস ওখানকার গ্রীষ্ম কাল। নীল ঝকঝকে আকাশ। পাইন বনের ভিতর দিয়ে একটা লোক চলার চোরাবাটো দিয়ে আমরা উপরে উঠতে থাকলাম। নিচে বিরাট বিরাট ফার্ণ গাছ আর কত রকম অজানা ফুলের গাছ। প্রায় চার ঘণ্টা যাবার পর ছোট পুকুরের মত জায়গা পেলাম। নীল জল। দেখি পদ্ম জাতীয় কিছু ফুল ফুটে আছে। দুটো সারস সাঁতার কাটছে। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। খালি পাইনের জঙ্গল আবছা দেখা যায়। আমরা এ জায়গায় দুপুরের খাবার খেলাম। আমি ডোমার সঙ্গে একটু গল্প করলাম। সুইডিস মহিলারা কি রকম ইংরাজী বলে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। যা বুঝলাম তারা কোফেনহেগেনে উদ্ভিদবিদ্যা আর এন্থোপলিষ্টের অধ্যাপক। ভুটানের এই মানুষের অগম্য জঙ্গলে এসেছে কিছু পরীক্ষা করতে।

আবার আমার সরু চোরাবাটো দিয়ে উঠতে লাগলাম। ঘন জঙ্গল একটু করে পাতলা হয়ে গেল। একদম ভেজা ভেজা রাস্তা দিয়ে আমরা উঠে এলাম একটা ফাঁকা জায়গায়। এখানে যে মানুষ আসে তা বোঝা যায়। রান্নার চিহ্ন আছে। এখানেই আমাদের আজকে থাকতে হবে। শেরপারা গোল করে তাঁবু খাটালো মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে দিল। দুজন করে একটি তাঁবুতে। ডোমা আমার তাঁবুতে শুতে চাইল। দুটি স্লিপিং ব্যাগে। সুইডিসরা তাদের টিন ফুড এনেছিল। আমরা শেরপাদের সঙ্গে খেলাম। সন্ধ্যার পর থেকে বরফ পরতে শুরু হল। আমরা ব্যাটারি লণ্ঠন জ্বালিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প করলাম।

ডোমার বাবা দ্রাঞ্চু অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি। তাঁর বিরাট প্রতিপত্তি। ডোমা পড়াশুনায় ভাল ছিল। থিম্পু থেকে বি এ পাস করে নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইংরাজীতে এম এ ভর্তি হয়। সেখানে একটি ভুটানের নেপালী ছেলের সঙ্গে ভালবাসা হয়। এম এ পাস করে বাবার অমতে

ছেলেটিকে বিয়ে করে। ছেলেটির বাড়ি ফুনশিলিং-এ। ওখানে সে চাকরিও নেয়। কিন্তু তাদের সম্পর্ক ভালো চলে না। ইতিমধ্যে ভুটানে নেপালী উৎখাত শুরু হয়। ডোমার স্বামীর পরিবারও উৎখাত হয়ে নেপালের ঝাপা ক্যাম্পে চলে যায় এবং সেখানে এক ধনী ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে ডোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। ডোমার বাবা ডোমাকে দ্রাঞ্চুতে বদলি করে আনে। ও এখন এখানেই আছে। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি এত সুন্দরী এত শিক্ষিত আবার বিয়ে করতে পার। বলল ভাবি নি। যদি মনে হয় তবে করব।

প্রচন্ড শীতের মধ্যে বাইরে শেরপাদের দুর্বোধ্য ভাষার গানের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সারারাত ধরে যে তুষারপাত হচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম। ভোররাতের দিকে দূরে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। অনেকটা শঙ্খের শব্দের মত। বুঝতে পারলাম ভয়ঙ্কর কিছু কারণ শুনলাম শেরপাদের তাঁবু থেকে উচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়ার আওয়াজ।

সকালবেলায় উঠে দেখি আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাঁবু সহ পুরো এলাকা বরফের নিচে চলে গেছে। আমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে কিছুটা উঠে গেলাম। একটা জায়গা অনেক পরিস্কার করা হয়েছে। পাশে কয়েকটা তাঁবু ঘোড়া খচ্চর দেখতে পেলাম। দু-চারজন লোক রান্নাবান্না করছে। তারা আমাদের সাবধান করে দিল। বলল ইয়েতি দেখা গেছে। আমরা যেন সাবধানে থাকি।

আমাদের তাঁবু এখানে খাটানো হোল। মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম একটা ন্যাড়া হিমবাহ। কিছু লোক দূরে দূরে উবু হয়ে কিছু খুঁজছে। সুইডিসরা তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে উপরে উঠতে থাকল। আমরাও পিছে পিছে গেলাম। দেখলাম বরফের ভিতর ছোট শিকড়জাতীয় গাছ। সেগুলো এই লোকগুলো বরফের নিচ থেকে বার করছে। ডোমা বলল এই শিকরগুলো ১০০০ ডলার করে কেজি বিক্রি হয়। এই অঞ্চলের কিছু লোক এগুলো সংগ্রহ করে। তবে অত্যন্ত বিপদশঙ্কুল কাজ। কারণ এগুলো বরফের ভিতর লুকানো থাকে। জুলাই মাসেই এগুলো পাওয়া যায়। তারপর বর্ষা নামলে পচে যায়। প্রচণ্ড ঠান্ডায় বহু লোক মারা যায়। এখানে ইয়েতিরা মাঝে মাঝে আক্রমণ করে মানুষকে ফালা ফালা করে মেরে ফেলে অথবা আহত করে। সেদিন ফিরে আসলাম। সুইডিসরা জেনসিং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাদের সংগ্রহ করা মাল কিনে নিল।

রাত্রে তাঁবুতে ডোমা আমাকে চমৎকার ভুটানী গান শোনাল। আমাকে নীল রঙের ফিরোজা পাথরের আংটি দিল। অনেক রাত্রে তাঁবুর পিছন দিকের অন্য একটি তাঁবু থেকে হৈ হৈ শব্দ শুনলাম। আমাকে শেরপারা বাইরে যেতে না করল। অনেক রাত পর্যন্ত হৈচৈ চলল। ভোর বেলায় ওঠামাত্র আমাদের কুক বলল কাল রাতে ইয়েতি একটা তাঁবুতে ঢুকে একজন ভুটানী কালেকটরকে মেরে ফালাফালা করে দিয়েছে। সুইডিস মহিলা দলের আসল উদ্দেশ্য এবার বুঝতে পারলাম। তারা কালেকটরদের অনুরোধ করতে থাকল যদি তারা ইয়েতিকে দেখিয়ে দিতে পারে তবে তারা তাদের পুরস্কার দেবে। প্রথমে অস্বীকৃত হলেও রাজি হল।

পরদিন সকালে কয়েকজন কালেকটার নিয়ে সুইডিসরা রওনা হল। আমরা গেলাম না। দুপুরের দিকে আমি ও ডোমা বরফের মধ্যে দেখবার জন্য উপরে উঠতে থাকলাম। আজ মেঘ কম। কাজেই ফাঁকে ফাঁকে অনেকদূর দেখা যাচ্ছিল। আমরা একটা বাঁকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। খুব সরু রাস্তা একজনের বেশি লোক যেতে পারে না।

হঠাৎ মাথার উপরে বরফের ভিতর ভারী কিছু নিচে নামবার শব্দ পেলাম। ঝুরঝুর করে বরফ পরতে শুরু করল। কিছু বোঝার আগে সরু রাস্তাটার উপর বিরাট একটা প্রাণী ঝুপ করে এসে পড়ল। সারা শরীর বাদামী কিন্তু মুখটা শরীর আন্দাজে ছোট আর অনেকটা মানুষের মত। ঘাড়ের উপর একটা বাচ্চা। প্রাণীটি আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। ডোমা ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। প্রাণীটি হঠাৎ তীক্ষ্ণ শঙ্কের ডাকের মত আওয়াজ করল। প্রচণ্ড শব্দ। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে অসম্ভব দ্রুত উঠে গেল উপরের দিকে এবং নিমেষে মিলিয়ে গেল। ডোমা বরফের মধ্যে বসে ভগবান বুদ্ধের নাম নিতে থাকল। চিৎকারের শব্দে কুকটি দৌড়ে উঠে এল। সব দেখে শুনে সে ভগবানের নাম নিতে থাকল। বিকেলে সুইডিসরা বিফল হয়ে ফিরে এল। সব শুনে হতাশা প্রকাশ করতে লাগল। সন্ধ্যায় শেরপা কুলিরা দলবেঁধে এসে বলল এখন ইয়েতিরা বাচ্চা দিয়েছে। এরা ভয়ঙ্কর। তারা কাল সকালে ফিরে যাবে। এমন কি

জেনসিং কালেকটারেরাও ফিরে যাবে। ম্যাডামরা যদি না ফেরে তা তাদের দায়িত্ব। বাধ্য হয়ে তারা ফিরতে রাজি হল। পরদিন সকালে আমরা ফিরে এলাম।

আজ এত বছর পরেও অনেক রাত্রে ঐ ঘটনার কথা মনে হলে সেই মা আর শিশু ইয়েতির কথা মনে হয়। ভুটান সরকার তাদের অভয়ারণ্য ঐ রকমই রাখুন। বেঁচে থাক ঐ প্রায় অদেখা প্রাণী।

শব্দছকের সমাধান

মামা ভাগনের কীর্তি

পীযূষকান্তি মজুমদার
এফ ই- ৫২

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে বিধ্বংসী ঝড় বা সাইক্লোনকে আমরা নানানামে ভূষিত করেছি। যেমন এই ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্ব উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের দরুণ যে ভয়ংকর প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোন সুন্দরবন এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে আছড়ে পড়েছিল, যার জন্য হাজার হাজার ঘর বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল, নদীবাঁধ ভেঙ্গে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নোনাজলে প্লাবিত হয়েছিল, সেই বিধ্বংসী তুফানের নাম দেওয়া হয়েছে আমপান, তেমনি আগের বৎসরগুলোতেও যে সাইক্লোন হয়েছিল, তাদেরও আমরা নানা নামে ভূষিত করেছি। ২০০৯ সালে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জন্য যে ভয়ংকর বিধ্বংসী ঝড় বা সাইক্লোন হয়েছিল, যা উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘরবাড়ি শস্যক্ষেত, রাস্তাঘাট এবং নদীবাঁধ---সব ধ্বংস করেছিল—তাকে আমরা এখনও ভুলতে পারিনি। তার নাম দেওয়া হয়েছে আয়লা।

তারপর ২০০৮ সালে নার্গিস ২০০৭ সালে সিডার এবং ১৯৯৯ সালের উড়িষ্যার সাইক্লোন আমাদের কিছুতেই ভুলতে দেবে না। ১৯৭০ সালে পূর্ববঙ্গের ভয়াবহ সাইক্লোন, যেটা ভোলা সাইক্লোন নামে পরিচিত। তার ধ্বংসলীলা আর ভয়াবহতা পূর্ববঙ্গের লোক এখনও ভুলতে পারেনি।

কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১৪৪ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের ৩১শে অক্টোবর, বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় পূর্ববঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে এবং মেঘনা নদীর মোহনার চারপাশের এলাকাতে যে তাণ্ডব এবং ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, সারা বিশ্বে তার তুলনা হয় না।

সমুদ্রের বিশাল বিশাল উঁচু ঢেউ উপকূবর্তী দ্বীপগুলোর উপর আছড়ে পড়ে এবং এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে ভোলা, হাতিয়া, সন্দীপ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি এলাকা এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল, কুতুবদিয়া প্রভৃতি অন্যতম।

এই ঝড়ের প্রকোপ বেড়েছিল ৩১ অক্টোবর রাত্রে, এই ঘূর্ণিঝড়ের এবং জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা এত বেশী ছিল যে প্রায় দুই লাখের উপর মানুষ জলে ডুবে প্রাণ-হারান। পরে কলেরা ও দুর্ভিক্ষে কত হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। ঐ ঝড়ের কোন নাম নেই। লোকে বলত 'মহাতুফান' তখন এই মহাতুফানের আগে বা পরে স্থানীয় লোকেরা কোন কিছু ঘটনার উল্লেখ করলেই বলত মহাতুফানের এত বৎসর আগে বা এতবৎসর পরে ঘটেছিল।

তখন ঝড়ের আগাম বার্তা দেওয়ার অর্থাৎ পূর্ব্বাভাস দেওয়ার কোন প্রযুক্তি ছিল না। দুর্গত মানুষদের নিরাপদ উঁচুস্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

বন্যায় পুকুর বা জলাশয়ের জল বিষাক্ত হয়ে মহামারী ছড়াত। ছিল না কোন রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা।

তাই মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী হয়েছিল, তখন ইংরেজ সরকার বন্যাপীড়িত বা তুফানে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে তেমন কোন সাহায্য করত না। ফলে এই মারণ ঝড়ের পর খাদ্যাভাবে ও রোগে আক্রান্ত হয়ে এত বেশী লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

এই বিধ্বংসী ঝড়ের সময় আমার পিতামহ (ঠাকুর্দা) কামিনী মজুমদারের বয়স ছিল ১৭ বৎসর। তাঁর বাবা শরৎচন্দ্র ও মা নিভাননীর বয়স ৫৪ বৎসর এবং ৪০ বৎসর। শরৎচন্দ্র অর্থাৎ আমার প্রপিতামহরা ছিলেন তিন ভাই শরৎচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র। এই তিনজনের বাবার নাম ছিল রামসুন্দর মজুমদার। রামসুন্দর মজুমদারের ভাই রামগতি মজুমদারের বংশ ধরেরা বাড়ির দক্ষিণ-দিকে থাকতেন বলে, সেই বাড়িকে দক্ষিণ-বাড়ি বলা হত।

আমার ঠাকুর্দা কামিনী মজুমদার এবং তাঁর মা বাপ এই ঝড়ের প্রত্যক্ষদর্শী। ঠাকুর্দা এই ঝড়ের গল্প একদিন তাঁর চার ছেলে—কালিপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন, তারাপ্রসন্ন

মজুমদার ও হরিপ্রসন্নকে একসঙ্গে ডেকে বলেছিলেন, আমার বাবা-দুর্গাপ্রসন্ন মজুমদার সেই গল্প-হুবহু আমাকে বলেছিলেন।

ঠাকুর্দার থেকে শুনে বাবা ১৮৭৬ সালের মারণ ঝড়ের যে বর্ণনা আমাকে করেছিলেন, আমি তাঁর ছেলে পীযূষ কান্তি মজুমদার ঠাকুর্দা বাবাকে যা বলেছিলেন তাই হুবহু বর্ণনা করছি।

ঠাকুর্দা কামিনী মজুমদার বলেছিলেন—

আমার বয়স তখন ১৭ বৎসর। সে ঝড়ের দিন কি বার ছিল আমার মনে নেই। সকাল থেকে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা ছিল। প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছিল। সকালের দিকে ঘণ্টা দুয়েক অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ার পর, দুপুর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। সারাদিন ঝোড়ো হাওয়া আর জোরে জোরে বৃষ্টি।

আমাদের মাটির ছোটবাড়ির বেশ পোক্ত দেওয়াল ২১/২ ফুট চওড়া। শণের ছাউনি। বৃষ্টির জলের ঝাপটায় দেওয়ালের বাইরের দিকে একটু ক্ষতি করে। এটাতে মাটির দেওয়াল নেই, তার পরিবর্তে দরজা জানলা বাদে, চারিদিকে মুরলী বাঁশের চাঁচ দিয়ে ঘেরা। এটাকে আমরা বেড়ার ঘর বলি। বর্ষায় জলের ঝাপটায় বা বন্যার জল এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। বর্ষাকালে এই ঘর নিরাপদ। ঘরের শণের ছাউনির চালাটা বাঁশের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মাঝবরাবর দুই দিকের প্রত্যেক দিকে একসঙ্গে তিনটি পাকা পোক্ত বাঁশের খুঁটি। সাইক্লোন বা ঝড় হলে আমরা সবাই এই দুইদিকের খুঁটি আঁকড়ে ধরে থাকি। মাঝে মাঝে এমন জোরে ঝড় হয় যেন আমাদের উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেবে। তাই খুব ঝড়ে বা সাইক্লোনে এই খুঁটি জোরে ধরে রাখতে হয়, চালা যাতে উঠে না যায় প্রায়ই তো আমাদের জেলায় বন্যা হয়। তাই বর্ষাকালে এই বেড়ার বাড়ির ভিতরের একপাশে বড় মাচা-বাঁধা থাকে মাচায় উঠার জন্য বাঁশের সিঁড়ি থাকে, বেড়ার ঘরে বন্যায় বা বৃষ্টির জল প্রবেশ করলে সিঁড়ি দিয়ে মাচায় উঠে জলের হাত থেকে বাঁচতে হয়। মাচার চারিদিকে দেড় হাত উঁচু ঘেরা থাকে যেন কেউ মেঝের জলের মধ্যে পড়ে না যায়।

ঘরে তখন আমি বাবা, মা আমার পিসতুতো বোন জগো (জগতারিণী দেবী) আর তার আট মাসের ছেলে বীরু বা বীরেন্দ্র, জগো দিদি বাচ্চা নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। বাবার শরীরটা কিছুদিন ধরে ভাল যাচ্ছিল না। প্রায়ই ভুগছেন। কবরেজ মশায় এসে দেখে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই দুর্যোগে আসতে পারছেন না, বাবা কোটাবাড়ির একটা ঘরে শুয়ে আছেন। মাও ঐ ঘরে বাবার কাছে আছেন। দিনতো কোন রকমে কাটবে। কিন্তু রাতটা কাটবে কি করে, একদিকে ঝড়ের এই তাণ্ডব সোঁ সোঁ আওয়াজ। অন্যদিকে ঝম্ ঝম্ কি বৃষ্টির শব্দ কারও কথা শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কড়্ কড়্ কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ল। সামনের গাছটার মাথায়। বাজের বিরাট শব্দে কানে তালা লেগে গেল।

বাবা বললেন কলা গাছের ভেলার ব্যবস্থা করতে হবে। রাতের বেলায় জল যদি বেশী হয় তাহলে তো মাচায় থাকা যাবে না ভেলায় করে সবাইকে জুড়ামণির দীঘির পাড়ে যেতে হ'বে। দীঘির পাড় খুবই উঁচু। ওখানে ভেলায় করে পৌঁছে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাতে হবে। এই ঝড়ের লক্ষণ একেবারে ভাল নয়। সাইক্লোন যত বাড়বে সমুদ্রের ঢেউও তত উঁচু হ'বে। বিরাট উঁচু ঢেউ উপকূলে আছড়ে পড়বে। তাতে জলের উচ্চতা বেড়ে যাবে। আমাদের বাড়ি বঙ্গোপসাগর থেকে ৬-৭ মাইল দূরে, এই তুফানে বাড়ি ঘরের যে কি অবস্থা হয় ভাবা যায় না। হয়ত জলে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মন্টু (কামিনীর ডাক নাম) তুই কাকাদের গিয়ে বল—সবাই যেন কলাগাছ কেটে ভেলা তৈয়ারী করে রাখে। রাতে যদি জল আরও বাড়ে তাহ'লে সবাইকে ভেলায় করে দীঘির পাড়ে আশ্রয় নিতে হ'বে। জুড়ামণি দীঘির পাড় সমতল থেকে ২০-২৫ ফুট উঁচু চারিদিকের পাড় এত উঁচু যে বন্যার জল এ দীঘিতে ঢুকতে পারে না। দীঘির জল বর্ষাকালে সবসময় টলটল করে। বৃষ্টির জলে দীঘির ভিতরের জলের উচ্চতা বেড়ে যায়, দীঘির চারকোণের প্রতি কোণায় ২ ফুট ব্যাসের পোড়া মাটির পাইপ লাগানো আছে। প্রতিটি পাইপ ৬ ফুট লম্বা প্রতি কোণায় এরকম ২৫টা পাইপ পরপর পোড়ামাটির 'কলার' দিয়ে দুটি পাইপের সংযোগস্থলে চূণ-সুরকি দিয়ে ভর্তি করে জোড়ালাগানো হয়েছে। তার উপরে ১৭-১৮ ফুট মাটি। দরকার হ'লে দীঘির জল পাইপ দিয়ে বের করা হয়-বাইরে ধানের জমিতে

চাষের জন্য। আবার বাইরে থেকে দীঘিতে জল ঢোকানো যায় পাইপের সাহায্যে। ভিতরে বাইরে পাইপের মুখ বন্ধ করা বা খোলার ব্যবস্থা আছে।

এই জুড়ামণির দীঘির চওড়া উঁচু পাড় বন্যার সময় আমাদের পটিয়া থানার কাশীয়াইস্ গ্রামের এবং কাছাকাছি গ্রামের সব লোককে আশ্রয় দেয়। পাড়ে এবং বাইরের ঢালে, বিশাল বিশাল তেঁতুল, মেহগান, আমলকী, তাল এবং জাম গাছে ভর্তি।

চারিদিকের সবুজ-গাছপালায় চোখ জুড়িয়ে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানারকম পাখীর কূজন—আশেপাশের লোককে মোহিত করে, বন্যার সময় এই দীঘির জল একমাত্র পানীয় জল।

আমাদের এই পূর্ববাংলার প্রতি থানাতে এরকম কয়েকটি দীঘি আছে যা বন্যার্ত্তদের আশ্রয় দেয় ও পানীয় জল সরবরাহ করে, এই সমস্ত দীঘি জমিদারবাবুরা প্রজার হিতার্থে বহু বহু বৎসর আগে খনন করেছিলেন।

আমি হাঁক দিয়ে গিরীশকাকা ও তাঁর ছেলে মহেন্দ্রকে ভেলা তৈরী করার কথা বললাম।

গিরীশ কাকা বললেন—শরৎদাকে বল চিন্তা না করতে। কলাগাছ কেটে ভেলা বানাবার ব্যবস্থা করছি। দরকার হ'লে সবাই একসঙ্গে দীঘির পাড়ে চলে যাব। আমি বাঁশ দড়ি ও খড় এই সবের ব্যবস্থা করছি। দক্ষিণ বাড়িতে হাঁক দিয়ে বল দরকার হলে ওদেরও দীঘির পাড়ে যেতে হবে।

গিরীশ কাকাকে বললাম—আপনি উত্তর বাড়ির পূর্ণ কাকা ও তার ছেলেদের বলুন যেন ভেলার ব্যবস্থা করে রাখে।

আমার মা নিভাননী দেবী অন্য একটা ঘরে বাবার কাছে বসে দুর্গা নাম জপছেন। বাড়িতে ছেলে বলতে আমিই শুধু আছি।

জপশেষে মা বললেন—আকাশটা কেমন কালো আর তামাটে হ'য়ে আছে। মনে হচ্ছে রাতে আবার খুব ঝড়-বৃষ্টি বা বন্যা হ'বে।

বৃষ্টি বা বন্যা হ'লে চোখে দেখা যায়, দুর্যোগ সামলাতে সময় পাওয়া যায়। কিন্তু ঝড় বা তুফান তো তাৎক্ষণিক। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে তাই বন্যা বা বৃষ্টিকে আমি তত ভয় পাই না, ঘূর্ণিঝড়কে বেশী ভয় পাই।

মা বললেন—মন্টু (আমার ডাক নাম) বেড়ার ঘরে জগোর বেটা একলা ঘুমোচ্ছে। তুই ঐ ঘরে চলে যা, জগো তো রাত্রের জন্য তাড়াতাড়ি রান্না করতে রান্নাঘরে গেছে, রাত্রে যদি খুব ঝড় বৃষ্টি হয় তাহলে তো রান্না করা যাবে না। জগোর ছেলে বীরু দোলনায় ঘুমুচ্ছে, ওর কাছাকাছি থাকিস, ঘুম থেকে উঠে কাউকে দেখতে না পেলে ও কান্নাকাটি শুরু করবে।

আমি বেড়ার ঘরে চলে গেলাম। ঘরটি বড় মজবুত। খুঁটিগুলো অনেকটা মাটিতে পোঁতা আছে যাতে ঝড়ে চালা উপড়ে না যায়।

জানলা দিয়ে পূর্বদিকে আমি দূরের দৃশ্য দেখছি। শীতকালে খুব সকালে রৌদ্র পোহানোর সময় পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের শ্রেণী অস্পষ্ট দেখা যায় এখন চারিদিকে কালো মেঘে ছেয়ে আছে। পুবের পাহাড় আর দেখা যাচ্ছে না। তবে পূর্বদিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রথমে দেখা যায় আমাদের বড় পুকুর, সারাক্ষণ তার জল টলমল করছে। তারপর প্রায় ৪০০ ফুট খালি উঁচু জমি। তারপর জুড়ামণির দীঘি। দীঘির পরে পূর্বদিকে মাইলের পর মাইল ধানক্ষেত, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজে সবুজ। সবুজ শস্য ক্ষেত্রের রঙ বদলে সবুজ থেকে সোনালী রঙে উত্তরণ হচ্ছে। বেশী-ঝড় হ'লে সব ধানগাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এবং বৃষ্টিতে ধান সমেত ধান গাছ মাটিতে মিশে যাবে। তারপর বন্যার জল জমলে ধান গাছ পচে যাবে। এত কষ্ট করে চাষীরা যে ফসল ফলিয়েছে তা তারা ঘরে তুলতে পারবে না। ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা যাবে।

সন্ধ্যা আসন্ন।

হঠাৎ উত্তরবাড়ি থেকে একটা আর্তনাদ শোনা গেল। পূর্ণকাকার ছেলেমেয়েদের কার কিছু হল নাকি। দুই বাড়ির মাঝে ঝড়ে ডালপালা ভেঙে পড়ায় রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ঝড়ে চোখে ভাল করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু সোঁ সোঁ আওয়াজ। আর তীব্র বেগে বয়ে যাওয়া বন্যার অনেক শব্দ। মনে হয় উপকূলে অতিকায় ঢেউ আছড়ে পড়ে সমতলের দিকে এগুচ্ছে। তার সাথে নদী-বাঁধ ভেসে গিয়ে দুরন্ত গতিতে বন্যার জল এগুচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় কি করব। আমার ভাগনে এই বেড়ার ঘরে কাঠের দোলনায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। একমাত্র শিশুরাই এরকম ঝড়, বৃষ্টি ও দুর্য্যোগে অঘোরে ঘুমাতে পারে।

আমাদের পোড়াবাড়ি, সেখানে মা বাবা আছেন সেটা এই বেড়া বা চাঁচের ঘর থেকে ১০-১৫ হাত দূরে। তারপর রান্নাঘর যেখানে জগো পিসি রান্না করতে গেছে। তখন জায়গার তো অভাব ছিল না। তাই ঘরগুলো দূরে দূরে আলাদা ছিল।

আবার আমি উত্তর বাড়ির দিক থেকে আর্তনাদ আর চেঁচামেচি শুনলাম। এখন আমি কি করব, আমাকে তো যেতেই হবে, চীৎকার করে বললে কাছের কেউ শুনতে পাবে না। এই চাঁচের ঘরে ছোট ভাগনে গভীর নিদ্রায়। তাকে তো একলা ফেলে চলে যাওয়া যায় না। বেশী ভাববারও সময় নেই। আমাকে উত্তর বাড়িতে পূর্ণ কাকার বাড়ি যেতেই হবে।

আমি হাতে একটা কাঠারি নিলাম। ভাগনেকে তো এখানে একলা ফেলে যেতে পারি না আবার মা-বাবার কাছে গিয়ে কিছু বললেই মা বাবা এই দুর্যোগে আমাকে বাইরে বে'র হ'তে দেবেন না। আমি আমার ছোট ভাগনাকে আমার ধুতির কোঁচড়ে নিলাম এবং শক্ত করে গিঁট দিয়ে কোমরে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললাম। তখনও ভাগনে গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছে। তারপর জয় মা মঙ্গলচণ্ডী বলে এই ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম, পূর্ণকাকার বাড়ি যাওয়ার পথে অনেক ডালপালা কাঠারি দিয়ে কেটে, কিছু ডাল সরিয়ে কিছু ডাল ডিঙিয়ে এগুতে লাগলাম।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। আশেপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অতিকষ্টে দেখলাম পূর্ণকাকাদের বেড়ার ঘরের চালা একদিকে অনেকটা কাত হ'য়ে পড়ে গেছে। আর অন্যদিকে কাকা কাকিমা, ছেলে মেয়েরা, বাঁশের খুঁটি চেপে ধরে বাঁচবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে আর আর্তনাদ করছে খুঁটি ছেড়ে দিয়ে কাকা কাউকে ডাকবার জন্য বাইরে বের হ'তে পারছেন না। বে'র হলেই হয়ত চালা ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে আর না হ'লে পড়ে যাবে, ওদের উপর। এই অবস্থায় আমি ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

আমি পূর্ণকাকাকে বললাম—কাকা এই বাঁশের খুঁটিগুলো হয়ত আর বেশীক্ষণ চালা ধরে রাখতে পারবে না। আমি তোমার সঙ্গে খুঁটি চেপে ধরি। কাকিমা যোগেন, রাজেন, বিন্দু, বাসন্তী ও দীনেশকে নিয়ে গিরীশ কাকাদের বাড়ি চলে যাক। সুযোগ বুঝে তুমি আর আমি একসঙ্গে খুঁটি ছেড়ে দেব এবং বাইরে চলে যাব।

কাকিমা ভাইবোনদের নিয়ে এই দুর্যোগে প্রাণ-বাঁচানোর জন্য ২০-৩৫ হাত দূরে গিরীশ কাকাদের বাড়ি চলে গেলেন।

তারপর আমরা দুজনেই বাঁশের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে ঘর থেকে বের হলাম। পূর্ণকাকা গিরীশ কাকার বাড়িতে চলে গেলেন।

আমরা বাঁশের খুঁটি ছেড়ে চলে আসার ২ মিনিটের মধ্যে খুঁটি গুলো ভেঙ্গে গেল এবং সমস্ত চালাটাই হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে আমরা বাইরে বের হয়েছিলাম।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে এবার বৃষ্টিও জোরে শুরু হল। উঠানে দেখলাম জলের উচ্চতা আগের থেকে বেড়েছে, তাড়াতাড়ি আমি আমাদের বেড়ার ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম জগো পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে। মাও ছুটে এসেছেন।

মা বললেন—বীরেন্দ্র কই! ও তো এই দোলনায় শুয়ে ছিল। তুই কি বীরুকে একলা রেখে বাইরে চলে গেছিলি। ওকে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি না হয় ঘরে শিয়াল ঢুকে মুখে করে তুলে নিয়ে গেছে। তুই ওকে একা ফেলে চলে গেলি কি করে? তুই বের হওয়ার সময় আমাদের কাউকে ডাকতিস। আমাদের মধ্যে কেউ বেড়ার ঘরে থাকতাম।

জগোর কান্নায় কিছু ভাল করে শুনতে পাচ্ছিলাম না তাছাড়া বাইরে ঝড়ের আর বৃষ্টির এত শব্দ।

আমি কেমন হক্‌চকিয়ে গেলাম। এঁরা কি বলছেন বীরুর কি হল? বীরুকে কি শেয়ালে নিয়ে গেছে?

তারপর আমার মনে পড়ল, বীরুকে আমি আমার কোঁচড়ে রেখেছি। চারিদিকে এত দুর্যোগ, এত ঝড় বৃষ্টি। আমাদের বেড়ার ঘর থেকে বের হয়েছি প্রায় আধঘণ্টা হ'য়ে গেছে। আমি ঝড়ের মধ্যে গাছের ডাল কেটেছি, ডাল

সরিয়েছি, পূর্ণকাকার ঘরে নিয়ে খুঁটি ধরে রেখেছি, এবং ওদের সঙ্গে কথা বলেছি—এত সময়ের মধ্যে বীরুর কোন নড়াচড়া বা কান্না শুনতে পাইনি। বীরু কোঁচড়ে আছে না পড়ে গেছে।

এবার আমি আমার ধুতির কোঁচড়ের দিকে তাকালাম। হাত দিয়ে কোঁচড় নড়াচড়া করলাম এবং কোঁচড় খুলে দেখলাম একটা ছোট্ট শিশু তখনও কোঁচড়ে ঘুমিয়ে আছে কোন সাড়া শব্দ নেই। চীৎকার করে বললাম—এই তো বীরু, আমার কোঁচড়ে আছে।

সবাই তখন ছুটে আসল। জগো দৌড়ে এসে ছেলেকে কোঁচড় থেকে বের করল। বলল—ওতো নড়াচড়া করছে না। আমার ছেলে আর নেই, তারপর জগো উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বীরুকে নাড়াচাড়া ও ঝাঁকাতে লাগলাম। গামছা দিয়ে ভাল করে গা-মুছে দিলাম।

মা বললেন—ভাতের জল গরম হ'চ্ছে ওখান থেকে এক বড়বাটি গরম জল নিয়ে আয়। তার সঙ্গে ঠান্ডা জল মিশিয়ে নে, জল একটু গরম থাকলেই হ'বে। তারপর ঐ অল্প গরম জলে গামছা ডুবিয়ে নিংড়ে সারা গায়ে আস্তে আস্তে বীরুকে সেঁক দে।

গরম জলে গামছা ডুবিয়ে এবং নিংড়িয়ে সেঁক দেওয়ার আগে বীরু হঠাৎ ওঁয়া করে কেঁদে উঠল।

আমি বললাম—ও জগো, ভাগনে বেঁচে আছে। গরম সেঁক দে আর গরম দুধ খাওয়া।

কার ভাগনে দেখতে হবে তো। সাবাস ভাগনা—তুই যথার্থ বীরপুরুষ—বীরেন্দ্র। আমার সঙ্গে বাইরে ঝড়বৃষ্টিতে সঙ্গ দিয়েছিস। টুঁ শব্দটি করিস নি। জগো ছুটে এসে বলল—ভগবান আমার ছেলেকে রক্ষা করেছেন। আমার ছেলেকে কোঁচড়ে রেখে এই ঝড় বৃষ্টিতে বাইরে এত কাজ সারলে। তারপর ঘরে এসে সবাই যখন বীরুর খোঁজ করছে তখনও তোমার স্মরণ নেই যে বীরু তোমার কাছে আছে। তোমার কোঁচড়ে ঘুমাচ্ছে, এমন ভুলোমন। ভূ-ভারতে এমন আর দ্বিতীয় নেই, ধন্যি মামা বটে তুমি।

আমি বললাম—ধন্যি আমার ভাগনেও। এ যে কুম্ভকর্ণের দ্বিতীয় সংস্করণ। এত ঝড়ে বৃষ্টিতে, এত লাফালাফিতে আমার ভাগনের হেলদোল নেই, টুঁ শব্দটি করেনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতে কোন কিছুই আমার ভাগনের কুম্ভকর্ণের এই ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। সব কিছু উপেক্ষা করে আপন মনে আমার কোঁচড়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

সবাই এই বিধ্বংসী তুফানকে মনে রাখবে আর ধ্বংসলীলার জন্য অগুনতি লোকের দুর্দশা ও মৃত্যুর জন্য কিন্তু আমি মনে রাখব আমার ৭-৮ মাসের ভাগনে বীরু বা বীরেন্দ্রর এই কীর্তির জন্য, এই দুর্য্যোগে সে আমার কোঁচড়ে আধঘণ্টার বেশী ঘুমিয়েছে।

আমার বাবা দুর্গাপ্রসন্ন মজুমজদার আমার ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করলেন—বাবা, সেদিন রাত্রে আর কিছু কি হ'য়েছিল।

আমার ঠাকুর্দা কামিনী মজুমদার বললেন—সেদিন রাত্রে তুফানের গতিবেগ—অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সারারাত জেগে আমরা মাচার উপর ছিলাম। আর গ্রামের মাটির বাড়িঘর পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনছিলাম। ভোরের দিকে বন্যা আরও বেড়ে গেল। সকালে ভেলায় করে আমরা, মজুমদার বাড়ির সবাই, দীঘির পাড়ে চলে আসলাম। দেখলাম গ্রামের আরও ৩০-৩৫টি পরিবার দীঘির পাড়ে বাঁশ খড় দিয়ে অস্থায়ী আস্তানা তৈরী করে আশ্রয় নিয়েছে। আরও অনেকে আসতে শুরু করেছে।

আমরা সবাই দীঘির পাড়ে অস্থায়ী আস্তানার মধ্যে চারদিন ছিলাম। বাড়ি থেকে চাল, ডাল নুনু, তেল বাসনপত্র, কাঠ ও কেরোসিন সব নিয়ে এসেছিলাম।

মজুমদার বাড়ির সবারই জন্য একসঙ্গে রান্না হত, অন্য যাঁরা চাল, ডাল তেল বা খাবার সামগ্রী আনতে পারেন নি, তাঁদের যাঁরা এসেছেন, তাঁদের থেকে দেওয়া হত, কেউ অভুক্ত থাকতেন না।

ইতিমধ্যে আমার সাত-আট মাসের ভাগনে বীরুর কীর্তি রটে গেছে। হয়তো জগোর মুখ থেকে সবাই শুনেছে। সবাই দলে দলে ওকে দেখতে আসল। সবাই বলাবলি করছিল বীরেন্দ্র নাম ওর ? যাবার সময় অনেকেই আমাকে দেখে গেলেন। বললেন—মামা বটে, এমন ভুলো মনের মামা কস্মিন কালে শুনিনি। কোঁচড়ে রয়েছে ভাগনে, মামা ঝড়-বৃষ্টির দুর্য্যোগে সবারই উপকার করে বেড়াচ্ছেন। ভাগনের কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। ধন্য বটে এই মামা।

ব্রাত্যরা

দেবপ্রিয়া চক্রবর্তী

এফ ই-৫০৭/৮

বিয়ের কিছু পর থেকেই বুধবার সকালটা অন্যান্য দিনের থেকে মনীষার কাছে সবসময়ই বেশি ঝলমলে। বস্তুত আমরা কেজো মানুষেরা যেভাবে রবিবারের জন্য হাতের কর গুনি মনীষা ঠিক সেভাবেই বুধবারের। কিন্তু আজ বুধবার হলেও মনীষার সকাল আজ ঝলমলে নয় যদিও তার বহু কাঙ্ক্ষিত প্রাণপুরুষ আজ কিছু দিন ধরে বাড়িতে। কারণটা পরে খোলসা করে বলা যাবে। তার আগে একটু পরিচয় পর্ব সেরে ফেলা যাক।

বাইরে থেকে দেখলে মনীষা-সৌরভের সংসার জীবন আর পাঁচটা সাধারণ সংসারের মতোই। আত্মীয় অনাত্মীয়রা যদিও মাঝে মাঝে বৈঠক বসায় ওদের সন্তানহীন হওয়ার ঘোর অনাচারটা ঠিক কার ঘাড়ে দিলে ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় হবে তা নিয়ে। অবশ্য এ নিয়ে সৌরভ বা মনীষা কেউই বিশেষ মাথা ঘামায় না।

সৌরভ এককথায় কেজো মানুষ। তার প্রথম ভালোবাসা তার কাজ। সৌরভের স্বপ্ন কর্মজীবনের একটার পর একটা সিঁড়ি বেয়ে উত্তরণের পথে এগিয়ে চলা।

সৌরভ মনীষার বিয়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। ফলত বিয়ের আগে একে অপরকে বোঝার খুব একটা সুযোগ হয়নি। বিয়ের পরেও মনীষার সৌভাগ্যে ভাটা পড়ে সৌরভের কাজের সূত্রে বেশিরভাগ সময়ই রাজ্যের বাইরে থাকায়।

মনীষা অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের। তার চোখ জুড়ে মায়া। কোনো কবির প্রেমিকার সৌন্দর্য্য বর্ণনায় ঠিক যেমন ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মনীষা ঠিক তেমনই সুন্দর। তার মনটিও ঠিক যেন তার মতোই সুন্দর। এমন স্পর্শকাতর মন এই যান্ত্রিক যুগে পাওয়া বিরল।

মনীষার সংসার স্বপ্নের মতো সাজানো। স্বাচ্ছন্দ্য তার বাড়ির প্রতিটি কোণায় কোণায়। কিন্তু মনীষার নিজেকে ওই গৃহসজ্জার অংশ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দিনের শেষে বিয়ের দুবছর পরেও শয্যাসঙ্গীকে অচেনা লাগে মনীষার। সৌরভ এর কাছে বৈভবই সব, ও বোঝে না, পার্থিব অভাব না থাকাই সম্পূর্ণতা নয়।

দুজনের বাবা-মা না হওয়ার কারণটাও ওদের ভাবনা চিন্তার মতোই আলাদা। যদিও সেই কারণ কেউ কাউকে জানায় নি, প্রয়োজনও হয় নি।

সন্তান হলে সৌরভের কাজের ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় সৌরভ এই ব্যাপারে কোনো কথা তোলে না। সৌরভ ভেবেছিল যতদিন মনীষা নিজে না বলে, বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়াই ওর কর্মজীবনের জন্য শ্রেয়।

আর মনীষার স্বতন্ত্র চিন্তাধারা বাধা দেয় মনীষাকে। যে মানুষটিকে দুই বছর পাশে পেয়েও চেনার সুযোগ হয় নি, তার সঙ্গে যা গড়ে উঠেছে, তাকে সখ্যতা বলা যায়, ভালোবাসা নয়। আর ভালোবাসাহীন যান্ত্রিক রতিক্রিয়ায় সৌরভের অংশ তার গর্ভে বড়ো হোক তা চায়নি মনীষা।

দুজনেই দুরকম ভাবনায় তাই সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল এই বাড়িকে একটি শিশুর হাসি কান্নার সাক্ষী হওয়ার স্বাদ দেওয়ার থেকে।

মনীষার একাকীত্ব কাটানোর সঙ্গী তার বাড়িতে ঠিকে কাজ করা চন্দনা। সোনারপুর থেকে বরের সঙ্গে ট্রেন ধরে শহরে আসে কাজ করতে। চন্দনার বর শিয়ালদহতে কোন গেঞ্জি কারখানায় কাজ করে। কাজ শেষে আবার দুজনে একসাথে বাড়ি ফিরে যায়।

স্বভাবতই চন্দনার পড়াশুনো খুব বেশি দূর না, কিন্তু তার মানসিকতা, চিন্তাধারা তথাকথিত ভদ্র সমাজের উন্নত মানুষদের থেকে উন্নততর বলেই মনীষার মনে হয়। দোষের মধ্যে একটাই, কথা বলতে শুরু করলে বিপরীতের লোক আর কথা বলার সুযোগ পায় না। কাজের পরে বেশ কিছু সময় বেঁচে যায় চন্দনার। তার বরের আসতে বেশ সন্ধেই হয়। এই সময় চন্দনা চা নিয়ে বৌদির সাথে নানান গল্প জোড়ে।

চন্দনার গল্প শুনতে শুনতে মনীষার একটা সুখ মিশ্রিত দুঃখের অনুভূতি হয়। ওর মনে হয় সৌরভ কেন

বোঝে না অর্থের থেকে জীবনসঙ্গীর সঙ্গের প্রয়োজন অনেক বেশি।

একদিন এমনই গল্প করতে করতে চন্দনা বললো ''জানো বৌদি সোনারপুরের কাছেই একটা 'AGO' আছে। সেখানে বৃদ্ধ মানুষেরা আর অনাথ শিশুরা একসঙ্গে থাকে। হেব্বি সুন্দর জায়গা।''

মনীষা হেসে ওকে বললো, ''ওরে ওটা 'AGO' না রে 'NGO'। এরা এমন এক সংস্থা যারা সমাজের স্বার্থে নিজেদের লাভ ছাড়া কাজ করে বুঝলি?

আর শোন কতবার তোকে বলেছি না 'হেব্বি' বলবি না, বলবি 'খুব'।''

চন্দনা লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলো। বললো ''ওই হলো বৌদি। তুমি বুঝেছো তো, ওতেই হবে। জানো তো ওখানে না তোমাদের মতো বৌদিরা বিনা পয়সায় পড়ায় গো। বাচ্চাদের সাথে সময় কাটায়, আবার কারোর জন্মদিন হলে কেক কাটা অনুষ্ঠান এসবও হয় শুনেছি। তুমি যাবে? তোমারও ভালো লাগবে, তোমারও তো বাচ্চাকাচ্চা...''

বলেই বড়ো ইতস্তত বোধ করলো চন্দনা। বিষয়টাকে স্বাভাবিক করার জন্য আবার বললো ''না গো বৌদি, যবে ইচ্ছে হবে তবেই নেবে। তোমরা কি আর আমাদের মতো, লেখাপড়া না জানা মানুষ? আমাদের তো আঠারোর আগেই বিয়ে, বছর গড়াতে না গড়াতেই বাচ্চা। দাদা তো বেশিরভাগ সময়ই থাকে না। তোমাদের তো আর আমাদের মতো কেউ তাড়া দেয় না। সব দিক দেখে তবেই...

মনীষা মনে মনে হাসলো আর বললো, ''দেয় রে তাড়াও দেয়, কথাও শোনায় তবে একটু অন্যভাবে ''মুখে বললো'' হয়েছে তোর অনেক বকবক, তা তুই কি শুধু গল্পই শোনাবি নাকি নিয়েও যাবি?''

চন্দনার তো খুশিতে লাফিয়ে ওঠার মতো অবস্থা। ''সত্যি যাবে বৌদি? গেলে কিন্তু গরিবের বাড়িতে দুটো ডাল-ভাতও খেয়ো।''

মনীষা বললো যাবো বৈকি, আর তোর বাড়িও যাবো। সোমবার দাদাবাবু কাজে শিলিগুড়ি যাবে আমরা মঙ্গল, বুধ দেখে যাই একদিন। সেদিন তোকে আর কাজে আসতে হবে না। আমি তোর সাথে সোনারপুর স্টেশনে দেখা করে নেবো।

সেই প্রথম মনীষার ধুপছায়া তে যাওয়া। এ এক অদ্ভুত প্রশান্তির জায়গা। এক দল অনাথ শিশু আর তাদের কাছে রয়েছে অনেক অনেক দাদু, দিদা।

মনীষা উপলব্ধি করলো এরকম প্রাণ খোলা হাসি সে অনেক বছর দেখে নি। শহুরে মেকি সভ্যতায় বড়ো বেশি যান্ত্রিকতা। এখানে তার ছায়া পড়ে নি যেন। মানুষ যে কত অল্পতে খুশি হতে পারে বাস্তবে বাঁচার মতো বাঁচতে গেলে যে তেমন কিছুই প্রয়োজন হয় না, মনীষার সৌরভ কে নিয়ে এসে দেখাতে ইচ্ছে করছিলো।

অফিস ঘরে ঢুকতেই একজন সহৃদয় ভদ্রলোক বেশ আপ্যায়ন করে বোললেন ''আপনি বুধবার করে এখানে আসতে পারেন। ওইদিন এখানে নানা অনুষ্ঠান হয়। আমাদের সাথে সময় কাটালে আশা করি আপনার ভালো লাগবে। ফ্রয়েডীয় থিয়োরি অনুযায়ী Defence Machanism কে আমরা এখানে কাজে লাগাই।

সন্তানের জন্য সর্বস্ব দান করে তাদের অবলম্বন হয়েও আজ যারা অবলম্বনহীন, আর যারা ছোটো থেকেই অবলম্বনের স্বাদ পায় নি, দেখুন তারা কেমন একে অপরের অবলম্বন হয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন, হেসে খেলে একে অপরকে ভালোবেসে।''

মনীষা হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলো তার এই ছুটে আসা তবে 'Defence Mechanism'।

মাতৃসুখের হাতছানি।

প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ দিয়েছিলো মনীষাকে ধুপছায়া। এত খুশি যেন আগে কখনো হয় নি সে।

নানান ধরণের রান্না করে নিয়ে যাওয়া, সবাই মিলে পুরোনো কলকাতার গল্প শোনা, বিভিন্ন মানুষের জীবনের চড়াই উৎরাই এর গল্প। কিভাবে যে গোটা দিন কেটে যেতো বুঝতে পারতো না মনীষা।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনের নানান গল্প শুনে ধীরে ধীরে বুঝেছিল মনীষা সম্পর্কের রসায়ন। জাদুর মতো আস্তে আস্তে আবিষ্কার করতে পারছিলো সৌরভকেও।

কিন্তু আজ বুধবার হলেও ধুপছায়ার যাওয়ার উপায় নেই মনীষার। lockdown এর জেরে পঁয়তাল্লিশ দিন হলো সব বন্ধ। কিন্তু মনীষার মন ধুপছায়ায়। বারংবার ফোন করেও ফোন এ পাওয়া যাচ্ছে না ধুপছায়ার কোনো

সদস্যকে। Social distancing maintain করতে গিয়ে কি আলাদা করে দেবে ওদের কে। নতুন করে ওরা যে হয়ে যাবে অবলম্বনহীন। বারো বছরের সোমা, ওর যে থ্যালাসেমিয়া। ওর রক্তের ব্যবস্থা হয়েছে তো? তপন বাবুর dialysis এর দিন ও তো এগিয়ে এলো। কী যে হবে? বড্ড অস্থির লাগছে মনীষার।

সৌরভ বাড়িতে, work from home চলছে। অনেকটা বেশি সময় কাটানোর সুযোগ এখন। lockdown এর জেরে মানুষ উপলব্ধি করেছে বাঁচার জন্য বিশেষ কিছু লাগে না। বিশেষ কে লাগে কেবল।

কিন্তু মন বসছে না তো।

আজকে মাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব তার সংসারের চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।

ওদিকে সৌরভ বললো এবার ফোনটা রাখো মনীষা, গাইনির appointment আছে। Sharp এগারোটায় ভিডিও কল করতে হবে। এখনো ওই কাটা ফল খাও নি। ডাক্তার কতবার বলেছে এই সময় খালি পেটে থাকতে না, ''মনীষার খুব ভালো লাগে সৌরভের এই যত্ন। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে ও। এই তো চেয়েছিলো মনীষা সৌরভের থেকে, যা lockdown তাকে উপহার দিলো।

এমন সময় ফোন চন্দনার ''ও দিদি, তুমি কেমন আছো? তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে বলো, সব কাজ এক হাতে সামলাতে হচ্ছে। চিন্তা করো না lockdown খুললেই আমি যাবো গো। ওর আবার কারখানা বন্ধ, তবে রেশনে পাওয়া চাল, ডাল দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওই covid না colid আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না গো। ছোটো বেলা থেকে তো ধুলো খেয়েই বড়ো হয়েছি, তোমরা সাবধানে থেকো।''

মনীষা চন্দনার কথা ভেবে ফোন রেখে মৃদু হেসে মনে মনে বললো ''ঈশ্বর তাই যেন হয়, চন্দনারা, পরিযায়ী শ্রমিকেরা, বাবা মা হারা সন্তান আর সন্তান থেকেও না থাকার মতো বৃদ্ধ অসুস্থ মাতা পিতারা যেমন মনের অনাক্রমত্যাওকে জয় করেছে, তেমন শরীরের অনাক্রমতাও জয় করতে পারে যেন।''

''আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক্,
আমার শুভে সকলের শুভ হোক্,
তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—
এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।''

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (শুভ উৎসব)